ঝিকিমিকি

শ্রীরাসবিহারী মণ্ডল

ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশক:

ডি, সি, ভট্টাচার্য্য

বাতায়ন পাব্‌লিশিং হাউস

৮৫, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আশ্বিন, ১৩৪৩

দাম: পাঁচ সিকা

ইউনিয়ন প্রেস

প্রিন্টার: ডি, সি, ভট্টাচার্য্য

৮৫, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ঝিকিমিকি

লেখকের অন্যান্য বই ঃ

মাটির মেয়ে—২৲
অগ্নি পরীক্ষা—১॥০
দিদির বর—১৲
আঁকাবাঁকা—১॥০
পরাহত—১॥০
স্ফুলিঙ্গ—১॥০
আগাছা—১৲

তিন ধাপ পাথরের সিঁড়ি বেয়ে সোজা তেতালায় উঠে ভদ্রলোক দরজার সামনে এসে থম্‌কে দাঁড়ালো। জোরে জোরে গোটাকয়েক লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে সে দম নিলে, পকেট থেকে রুমাল বের্ ক'রে কপালের ঘাম মুছ্‌লে, তারপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম ক'রে দরজার বুকে ধীরে ধীরে চাবি লাগালে।

দরজার ওপর একখানা ঝক্‌ঝকে পিতলের প্লেট,—তার ওপর কালো মোটা হরফে লেখা রয়েচে, সহদেব সরকার।

শীতের রাত্রি। এরি মধ্যে চারিদিক স্তব্ধ হ'য়ে এসেছে। সহরের ব্যবসা কেন্দ্রের বাড়ী, রবিবারে সন্ধ্যা না হ'তে হ'তেই চারিদিক নিঝুম নিস্তব্ধ হ'য়ে ওঠে।

সুইচ্‌ টিপতেই ঘরখানা আলোর বন্যায় ঝল্‌মল্‌ ক'রে উঠলো। সাহেবী কেতায় ঘরখানি সাজানো। মেঝের ওপর পুরু বিচিত্র রঙের গালিচা। প্রত্যেক আসবাবপত্রটি দামী, সুন্দরভাবে সাজানো।

ঘরের মাঝে দাঁড়িয়ে একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে সহদেব

একটা শোফার ওপর দেহটা এলিয়ে দিলে। আজ তার নিজেকে ভারী ক্লান্ত, ভারী অবসন্ন মনে হলো। দেহ মন যেন অবসাদে ভেঙ্গে পড়চে, অথচ এমন ভাবে ভেঙ্গে পড়বার মতো তো কোন কিছু ঘটেনি। সন্ধ্যায় ময়দানে খানিকটা ঘুরে ক্লার্ক সাহেবের ওখানে ডিনার খেয়ে বাড়ী ফিরচে। এমন তো প্রতি রবিবারেই কোথাও না কোথাও নেমন্তন্ন থাকে, কিন্তু এমন ক্লান্তিতে তো তাকে ঘেরে ফেলেনি কোনদিন। আজ যেন নিজেকে ভারী শ্রান্ত মনে হলো। সত্যিই সে শ্রান্ত! মৃত্যুর অবসাদ যেন তার দেহমন পরিব্যাপ্ত ক'রে ফেল্লে, তরল শিখার মতো! তার ওঠবার শক্তি নেই, উঠে বিছানায় গিয়ে শোবার মতো শক্তিও তার নেই।

কেন? এত ক্লান্ত কেন?

সহদেবের মনে হলো সে বুড়ো হয়ে যাচ্চে, মৃত্যুর সঙ্কেত ধ্বনি তার কানের কাছে ঝিঁ ঝিঁ পোকার সুর তুলেচে।

সহদেবকে দেখলে বোঝা যায় না, বয়স তার গড়িয়ে গিয়ে কতদূরে পৌঁচেছে। গভীর চিন্তায় কর্ম্মশ্রান্ত সহদেবকে দেখলে মনে হয় তার বয়স পঞ্চাশ বছরের কম হবে না। সাধারণতঃ তার মুখে পঞ্চাশের ছাপ কিন্তু এখনো পড়েনি। আবার যখন সে হাল্কা মনে হাসির হিল্লোল তোলে, তখন কে বলবে তার বয়স চল্লিশ পার হয়েচে।

বাইরের স্তব্ধতার মতই তার মনটা ভারী হয়ে উঠলো, সারা দেহ অবসাদে ছেয়ে ফেললে। নিজেকে আজ ভারী নিঃসঙ্গ,

ভারী নিঃসহায় মনে হলো। বিস্তৃত শূন্য ঘরখানার মতো তার অন্তরটা খাঁ খাঁ করতে লাগলো। রাত্রির স্তব্ধতা ঘরের মাঝে ঘন কুয়াশার মতো ঝুলতে লাগলো।

শক্ত পাথরের মতো সে স্তব্ধ হ'য়ে রইলো। কেমন একটা আতঙ্কে তার দেহটা শির্ শির্ করতে লাগলো। সে চোখ বুজে স্মৃতির উৎক্ষিপ্ত তরঙ্গের মাঝে চিন্তারাশিকে ভাসিয়ে দিল।

এই কথাটাই বারবার তার মনে হতে লাগলো, সে বুড়ো হ'য়ে যাচ্চে, বয়স বাড়চে, দিন ফুরিয়ে আসচে—

সত্যি! সত্যিই তো বয়স বাড়চে, বুড়ো হয়ে যাচ্চি—

চোখ খুল্‌তেই তার দৃষ্টি পড়লো শোফার ওপর নিজের বিস্তৃত একখানা হাতের দিকে।

স্থির অবিচলিত দৃষ্টি দিয়ে সে হাতখানার পানে চেয়ে রইলো। সমগ্র চেতনা দিয়ে সে যেন গভীরভাবে সেখানাকে বিশ্লেষণ করতে চায়। কী অস্বাভাবিক সাদা! যেমনি শীর্ণ, তেমনি বিশুষ্ক! কালো তারের মতো শিরাগুলো সোজা হ'য়ে উঠেচে, চামড়াখানা লোল হ'য়ে এসেচে, নখের মাঝে সরু সরু ঢেউ ফুটে উঠেচে,—বুড়ো মানুষের হাত! মৃত্যুর প্রভাবস্পর্শ সুস্পষ্ট।

স্থির দৃষ্টি দিয়ে চেয়ে চেয়ে একসময় তার চোখ দুটি বুজে এলো, মাথাটা ঝুঁকে পড়লো, সামনের পানে।

ঘুম তার আসেনি, শুধু সে ক্লান্ত ও দুর্ব্বল।

সে মনের চোখ প্রসারিত ক'রে স্তিমিত ঘোলা দৃষ্টি দিয়ে

ঝিকিমিকি

বিগত জীবনের পানে চেয়ে দেখলে, যতদূর দেখা যায়, বিস্মৃতির কুয়াশা ঠেলে যতদূর দৃষ্টি চলে। কুয়াশা ঢাকা বিস্তৃত বনানীর মতো জীবনের বিগত দিনগুলো স্পষ্ট হ'য়ে ভেসে উঠলো। কী করুণ, কী হতাশভরা দিনগুলো!

তার মনে হলো, জীবনটা তার একটা বিরাট পরাজয়, একটা দুঃখের পাহাড়, যেমনি রুক্ষ, তেমনি শুষ্ক কঠিন! এতটুকু স্নিগ্ধতার আভাস নেই!

এই দীর্ঘ জীবনে সে করলো কি? পেলে কি? কিছু না—কিছু না। শুধু অপার শূন্যতা বয়েই জীবনে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। নিঃসঙ্গ, নিঃসহায়! আজ্‌কের রাতের এই নিদারুণ অবসন্নতার মাঝে তার নিজেকে ভারী একা মনে হলো। ভারী কম্বলের মতো এই নিঃসঙ্গতার অনুভূতি তার দম যেন বন্ধ করে দিল।

সহসা একটা ঝাঁকানি দিয়ে মাথাটা তুলে সোজা হয়ে বস্‌লো। ভেতরে সে একটা কাঁপুনি অনুভব করলে।

কাছেই একটা টেবিলের ওপর সাজানো রয়েছে, হুইস্কি ভরা ডিকেণ্টার, সোডার বোতল ও কাঁচের গ্লাস! ভারী চোখ দিয়ে সহদেব টেবিলের পানে চেয়ে রইলো, অবসন্ন দেহমন হয়তো এমনি কিছু চায়, ডিকেণ্টারের গর্ভনিহিত একটু তরল পদার্থ তার দেহের এই অপরিসীম অবসাদ মুছে দিয়ে তাকে সতেজ করে তুলবে।

সে ওঠবার চেষ্টা করলো। কিন্তু, না, সে ভারী ক্লান্ত, ভারী

দুর্ব্বল। ওঠবার মতো শক্তিও তার নেই। এতখানি পরিশ্রম তার অবসন্ন দেহ সইতে পারবে না।

নিস্পন্দের মতো সে শোফার উপর আড় হয়ে শুয়ে রইলো। মন ছুটলো পেছনের পানে।

মাত্র ঘণ্টাখানেক পূর্ব্বে যাদের সঙ্গ সুখ তাকে অজস্র আনন্দ দিয়েচে তাদের কথা মনে পড়লো। কিন্তু এরি মধ্যে তারা মনের চোখে ঝাপ্‌সা ও অস্পষ্ট হ'য়ে এসেচে, তাদের যেন সে মনে করতেই পারে না। কবে এক বিস্মৃত সন্ধ্যায় তাদের সাথে দেখা হ'য়েছিল, আজ আর সে কথা ভেবে লাভ কি? কতো লোকই যে তার জীবন সমুদ্রে ফেনার মতো ফুটে উঠে মিলিয়ে গেল, কে তার সন্ধান রাখে? তাদের মনে রেখেই বা তার লাভ কি? তাদের সাথে অন্তরের কতটুকু সম্বন্ধ?

না, না, জীবনে সে কিছু পায় নি। স্নেহ, ভালবাসা, জীবনে যা কিছু সান্ত্বনার, যা কিছু জীবনকে সরস ক'রে তোলে তার কোন সন্ধানই জীবনে তার মেলেনি।

সহদেবের জীবনে কি তবে মনে ক'রে রাখবার মত কেউ কোনদিন ছিল না? কোন আকর্ষণ ছিল না তার জীবনে?

মন তার পিছু ফিরে তাকালো, পঁচিশ বছর পূর্ব্বের পানে।

দুই

সহদেবের বয়স তখন মাত্র একুশ। সবেমাত্র বি, এ পাশ ক'রে একটা সামান্য মাইনের চাকরী পেয়েচে। বাল্যে পিতৃমাতৃহীন, দূরসম্পর্কের এক কাকার বাড়ীতে থেকে লেখা-পড়া শিখেছিল। স্নেহের কোন বন্ধনই তার ছিল না।

মন তখন তার অবারিত আকাশের মতই শুভ্র, নির্ম্মল মনের আকাশে রূপ ও রঙ বদ্‌লাচ্চে ক্ষণে ক্ষণে। অজস্র রঙীন আলো তার চোখে জাল বুন্‌চে, বৈচিত্র্যের পিপাসায় সংসারের যা কিছু সুন্দর, যা কিছু শুভ্র তারই পানে মন ছুটতে চায়। মনের আনাচে কানাচে তখন তার বসন্তশোভা।

পাশের বাড়ীর রায়বাহাদুরের কিশোরী মেয়ে মলিনা তার চোখে দুর্ভেদ্য রহস্যের মতো জটিল হ'য়ে উঠ্‌লো।

প্রাণের প্রাচুর্য্যে সে অগাধ স্নেহ ও অপরিমিত শ্রদ্ধা ঢেলে দিল মলিনার কানে কানে। প্রতিনিয়ত সে ইঙ্গিতে তার অন্তরের গোপন ভাষাটি নিবেদন করে মেয়েটীর কাছে।

মলিনা লাজুক মেয়ে নয়, ভালো লাগতো তার এই

ছেলেটির মুখের হাসি, সকরুণ চোখের মিনতিভরা চাউনি। মুখর আনন্দে মর্ম্মরিত হ'য়ে পুষ্পস্তবকের মতো হেলে দুলে মলিনা চলে যায়। পিছনে ছড়িয়ে পড়ে তার লীলায়িত অঙ্গমাধুর্য্য।

সহদেব বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে।

অন্তরঙ্গতা ঘন হয়ে উঠলো। রায়বাহাদুরের বাড়ী সহদেবের অবাধ গতি। রায়বাহাদুরের পত্নী তাকে স্নেহ করেন। তাঁদের অজ্ঞাতে সহদেব ও মলিনা পরস্পরের পানে এগিয়ে চল্‌লো, অসীম আগ্রহে।

সহসা একদিন সহদেব বুঝলো, মলিনাকে শুধু চোখ দিয়ে দেখা চল্‌তে পারে, কিন্তু আপনার ক'রে পাওয়া যেতে পারে না। কারণ সে গরীব, তার অর্থ নেই, মলিনাকে পাবার মতো কোন সঙ্গতিই তার নেই! সহদেবের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়লো।

রায়বাহাদুর স্পষ্টই তাকে বুঝিয়ে দিলে, টাকা না হ'লে ভালোবাসার কোন মূল্যই নেই।

অশ্রুসজল চোখে, কম্পিত গলায় সহদেব জানিয়ে দিল, আপনার মেয়েও কিন্তু আমাকে ভালোবাসে।

ব্যঙ্গের হাসিতে মুখ ফিরিয়ে রায়বাহাদুর উত্তর দিল, মেয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি তার বিয়ে দোব না। নিজের অবস্থা ফেরাতে পার তো তোমার হাতেই তাকে দেব।

সহদেব নীরব, নির্ব্বাক!

রায়বাহাদুর যেতে যেতে বল্‌লে, শুধু ভালোবাসার দোহাই দিয়ে তো তাকে তোমার হাতে উপোস ক'রে মর্‌তে দিতে পারি না।

তারপর—

সবার চোখের আড়ালে, অন্ধকারের গোপনতায় কত যে অশ্রু সহদেব নিঃশব্দে ফেলেচে, শুধু সেই জানে, আর জানে তার অন্তর্য্যামী!

কিন্তু শুধু চোখের জল ফেলেই সে ক্ষান্ত হয়নি।

প্রাণপাত পরিশ্রম করে নিজের অবস্থাকে উন্নত করতে চেষ্টা কর্‌লো।

কী প্রাণপাত পরিশ্রম সে! কী একাগ্র তপস্যা! বিদেশে বিভূঁয়ে, অনাহারে অনিদ্রায়, উল্কার মতো ছুটে বেড়ালো সে পৃথিবীর এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত!

মা লক্ষ্মী প্রসন্নদৃষ্টিতে চাইলেন। কিন্তু অর্থের মোহ তাকে ভুলিয়ে দিল তার মলিনাকে। মলিনাকে পেতে হ'লে, তাকে সুখী করতে হলে যে কতখানি সম্পদের প্রয়োজন, তার পরিমাপও ছিল না, সহদেবের জানাও ছিল না, কাজেই সহদেব অক্লান্ত পরিশ্রমে শুধু অর্থ উপার্জ্জনই ক'রে গেল, দিনের পর দিন, বছরের পর বছর। ভুলেই গেল সে মলিনার বাবার কাছে

মলিনাকে চাইতে! কাজের ভিড়ে হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন বেদী হ'তে মলিনা গেল অদৃশ্য হ'য়ে।

সহদেবের অতীতটা গেল মরীচিকার মতো মিলিয়ে, ভবিষ্যৎটা হ'য়ে উঠলো, তীব্রোজ্জ্বল। তার পিছনের সবটাই অন্ধকার, গভীর নৈরাশ্যের ছায়া। ওর জীবনে জ্বল্‌বার যা কিছু ছিল, তা একবার মাত্র দপ্‌ ক'রে জ্বলেই প্রবল ধাক্কা খেয়ে নিভে গেল। সেই আঁধারের ছায়ায় মলিনা গেল লুপ্ত হয়ে।

হঠাৎ একদিন সহদেব সংবাদ পেলে, মলিনা সত্যই লুপ্ত হয়ে গেছে, শুধু তার অন্তর হ'তে নয়, নিখিল বিশ্ব হ'তে। তিন-দিনের জ্বরের তাপে অমলিন ফুলটি শুকিয়ে ঝরে গেছে।

বিশ্বসংসার সহদেবের চোখে ঝাপ্‌সা হয়ে এল। রিক্ত বুকে, সিক্ত চোখে সহদেব ক'দিন গুম্‌ হ'য়ে রইল। কিন্তু সে ক'দিনই বা! আবার গা ঝাড়া দিয়ে সহদেব কার্য্যক্ষেত্রে নেমে পড়লো। প্রতিদিনের বাঁধা কাজে জীবন আবার গড়িয়ে গেল। ব্যবসার চর্চ্চায় অন্তরটা তার এমনি ঠাসা ছিল, আর অবকাশ তার এত প্রশস্ত ছিল না যে মলিনার স্মৃতি অবসরের ফাঁকে চঞ্চল হাওয়ার মত তার গভীর নিঃশ্বাসকে এলোমেলো করে দেবে। আর মনকে সেই এই বলে বোঝালে যে যখন নিজেকে বাঁচতেই হবে তখন মলিনার স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকার চাইতে অন্য কোন অবলম্বনকে সম্বল করে বাঁচাই

ভালো। ঝাপ্‌সা আলোর দিকে অপলকে চেয়ে থাকার কোন মানে হয় না।

কাজের মাঝে ডুবে সে অদ্ভুতভাবে নিজের জীবনকে গ'ড়ে তুল্‌লে। কার্য্যক্ষেত্র ছাড়া তার সমাজ রইল না, কর্ম্মই হ'ল ধর্ম্ম, অর্থ ই হলো একমাত্র উপাস্য। কাউকে সে চাইলে না, তাকেও কেউ চাইলে না। মনের সম্পর্ক কারুর সাথে সে পাতালে না, ভরসা করে কেউ তার কাছে এগোলো না। নির্ব্বান্ধব, নিঃসম্পর্ক অবস্থায় সে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর কাটিয়ে দিলে।

জীবন সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে গা ভাসান দিয়ে সে দ্রুততালে এগিয়ে চল্‌লো। ঐশ্বর্য্যের স্তূপের ওপর ব'সেও মৌন যোগীর মত সে ঐশ্বর্য্যেরই তপস্যা করলে, সারাটি জীবন। স্নেহ ভালবাসা আবাদের উপযোগী যে নরম জমীটুকু অন্তরের মাঝে ছিল, রিক্ততার কাঠিন্যে সে জমীটুকু ক্রমশঃ পাথর হয়ে গেল।

জীবনটা সহদেবের সত্যিই ভারী অদ্ভুত! স্বেচ্ছায় চির-নির্ব্বাসন দণ্ড মাথায় নিয়ে সে জগতের বাইরে ঘুরে বেড়ালে।

আজ পেছন পানে চেয়ে চেয়ে সে শিউরে উঠতে লাগলো। স্তব্ধ রাত্রির মতো পিছনের জীবনটাও তার বিশ্রী স্তব্ধ গুমোট ভরা। হাসি নেই, কান্নাও নেই। স্নেহ কাউকে সে দেয়নি, কারুর স্নেহ সে কুড়োয়নি, জীবনের পিছনে এতটুকু কলরব কোলাহল নেই, মনে ক'রে রাখবার মতো কিছু নেই। তার মনে হলো জীবনের তার শিকড় নেই, আকর্ষণ নেই। নিজেকে

কেমন শ্রীহীন, ধর্ম্মহীন মনে হতে লাগ্‌ল। সারাজীবন সে নিজেকে বঞ্চিত করে আত্মবিস্মৃতির অন্ধকারে লুকিয়ে রেখেচে। নিজের বিরুদ্ধে আজ মন তার বিদ্রোহের সূচনা করলে।……

সে ক্লান্ত। অপরিসীম ক্লান্তিতে তার দেহমন ভেঙ্গে পড়লো। সে বিশ্রাম চায়। নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রাম।

তিন

পরদিন প্রভাতেই, ম্যানেজারের কাছে বিদায় নিয়ে সহদেব এসে হাজির হলো, পশ্চিমের এই সহরে। সঙ্গে একটা চাকর পর্য্যন্ত সে নিলে না।

পশ্চিমের সহর। সহরের কোলে ছোট পাহাড়ের ঘেঁষা-ঘেষি। ঢেউ খেলানো আঁকা বাঁকা রাস্তা। রাস্তার বুকে কাঁকর বিছানো। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সহরটি। ফাঁকা মাঠের বুকে ছবির মতো রঙ বেরঙের বাঙ্‌লো। রাস্তার পাশের উঁচু জমীতে সারি সারি দেবদারু আর ইউক্যালিপটাস্। কোথাও শুধু পাথরের রাজত্ব, অতিকায় হাতির মতো গা ঢেলে দিয়ে পড়ে আছে।

খুব একটা উঁচু জায়গায় পাথরের বুকের উপর ছোট বাঙ্‌লো 'লালকুঠি'। সেই বাঙ্‌লো ভাড়া নিয়ে সহদেব এসে উঠলো।

প্রথম দিন দুই সহদেব বাঙ্‌লার আশে পাশে ঘুরে বেড়ালে। সহরে ঢুক্‌লো না, রাস্তায় নাম্‌লো না। প্রতিবেশী কারুর সাথে আলাপ করলো না, তারাও কেউ এলো না তার সাথে আলাপ জমাতে।

সহদেব লম্বা ড্রেসিং গাউনে দেহ ঢেকে বাঙ্‌লোর বারাণ্ডায় ব'সে চুরুট টানে। আশপাশের বাড়ীর লোকেরা বিস্ময়ে তার মুখের পানে তাকাতে তাকাতে চলে যায়।

সহদেব স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে চুরুট টানে আর ঊর্দ্ধমুখে গাছের নীল পাতার পানে চায়, ধূম ও ধূলিবিহীন নির্ম্মল আকাশের পানে চেয়ে দেখে। ঘুমের চমকভাঙা চোখে এম্‌নি ভাবে সে সবিস্ময়ে চেয়ে থাকে যেন সে অপ্রত্যাশিত কিছুর সন্ধানে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে আছে। এতদিন যাদের জানা উচিত ছিল অথচ জান্‌বার চেন্‌বার অবকাশ মেলেনি, সেই সব না-জানা না-চেনা রহস্যের সন্ধান মিলেচে অপ্রত্যাশিতভাবে, তাদের সাথে পরিচিত হ'তে চায় পরিপূর্ণভাবে!

আকাশ এতো উজ্জ্বল, এতো নীল, গাছের পাতার ফাঁকে আলোর উন্মাদনা, পাখীর কাকলীর মাঝে এমন সুরের ঝঙ্কার, পাহাড়ের বুকে স্বপ্নজাল আঁকা ভোরের কুয়াশা,—এদের যেন সহসা আজ সে আবিষ্কার করেছে। তার আড়ষ্ট চেতনা যেন আজ আনন্দের স্পর্শ পেয়ে চিরপরিচিতের সাথে নতুন ক'রে পরিচয় করবার জন্যে আগ্রহে ফুলে ফুলে উঠছে।

সহদেব তাই সবিস্ময়ে ভাবে, এরা তো চিরপরিচিত, কিন্তু এরা সহসা এমনভাবে রূপ বদ্‌লালে কেমন করে?

দিন দুই পরে।

ঝিকিমিকি

শীতের ঘন কুয়াশা মাটির বুক হ'তে উঠে সারা সহরটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। বেলা হয়তো খানিকটা হ'য়েচে, কুয়াশার ঘন পর্দ্দার আড়াল ঠেলে সূর্য্য নিজেকে প্রকাশ করত পারচে না। চারিদিকে ঝাপসা গাছপালাগুলো নিবিড় অস্পষ্টতার মাঝে আবিষ্টের মত স্তব্ধ হ'য়ে আছে।

সারা দেহ আলোয়ানে ঢেকে, হাতে একটা ছাতা নিয়ে সহদেব বাঙলোর বাইরে এসে দাঁড়ালো। নীচের রাস্তায় লোকচলাচল আরম্ভ হয়েচে। সকলে চলচে বাজারের দিকে। সহদেব ঢালু জায়গাটা অতিক্রম করে বড় রাস্তার মুখে এসে দাঁড়ালো। তারপর উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে সোজা রাস্তা ধরে এগিয়ে চল্‌লো। তার পাশ কাটিয়ে কত নরনারী রঙ্‌ বেরঙের বেশভূষায় দেহ ঢেকে চলে যায়, সহদেবের চোখে চমক লাগে, আড়ষ্ট চেতনায় আনন্দের ছোঁয়াচ লাগে।

সে চল্‌তেই থাকে, অপ্রত্যাশিত নতুনতরো রহস্যের সন্ধানে। সংসারে দেখবার ধন অনেক ছিল, দেখা হয়নি, চোখ মেলে সে দেখেনি। পাবার মত অনেক কিছু ছিল, সে পায়নি, সে চায়নি। কেন যে পায়নি, কেন যে চায়নি, তাই ভেবে মন তার বিদ্রোহী হ'য়ে ওঠে।

রাস্তার পর রাস্তা পার হ'য়ে সহদেব বাজারের কাছে এসে পৌঁছল। পথের বাঁকে একটা দোকান, সেখানে বেশ ভীড় জমেচে। সহদেব অন্যমনস্কভাবে দোকানের সাম্‌নে এসে থম্‌কে দাঁড়ালো।

বাঙালীর দোকান। মনোহারী, ষ্টোর্স, কাপড় জামা, খবরের কাগজ, সবই পাওয়া যায় এই একটী দোকানে। অকারণেই দোকানের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে সহদেবের কেমন লজ্জা বোধ করলো। সে দোকানের ভিতরে গিয়ে একখানা ইংরাজী সংবাদপত্র কিন্‌লে।

দোকানের মালিক এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। সহদেব নতুন লোক। কাজেই বৃদ্ধ দোকানদার সহদেবের সাথে আলাপ করলে। বল্‌লে, নতুন এসেচেন বুঝি? কোথায় এসে উঠেচেন?

সহদেব একখানা লোহার চেয়ার টেনে নিয়ে ব'সে বল্‌লে, ঐ লালকুঠিতে দিন দুই হলো এসেচি—

দোকানদার জিগগেস্ করলে, আজই বুঝি প্রথম বাজারের দিকে এলেন?

সহদেব একটা চুরুট ধরিয়ে ঘাড় নাড়লে।

—দেখিনি কিনা, তাই জিগগেস করলুম। বাঙালী ভদ্রলোক যে কেউ এখানে আসেন, গরীবের এ দোকানটীতে সকলেরই পায়ের ধূলো পড়ে।

সহদেব ঈষৎ হাসলে।

দোকানদার জিগগেস করলো, এখন কিছুদিন থাকবেন তো? সপরিবারে এসেচেন নিশ্চয়ই।

সহদেব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌লে, আজ্ঞে না, আমি

একাই এসেচি। ভালো লাগলে কিছুদিন থেকে যেতেও পারি। নইলে আবার কালই চ'লে যেতে পারি।

দোকানদার হেসে উত্তর দিল, আজ্ঞে না। মন টিকে যাবে, আর এখানকার স্বাস্থ্য এখন চমৎকার।

এখানকার মানুষের সাথে সহদেবের এই প্রথম আলাপ লোকটিকে বেশ লাগলো সহদেবের। গভীর মনযোগ দিয়ে দোকানের জিনিষপত্রগুলি দেখলে। সবরকম জিনিষই প্রায় মজুত আছে দোকানটিতে। দোকানটির আর একটি আকর্ষণ, দোকানের সংলগ্ন একটি ছোটখাট লাইব্রেরী আছে। ছোট্ট সহরটিতে ঐ একটিমাত্র লাইব্রেরী, কাজেই সকাল সন্ধ্যায় অনেকেই এসে ভিড় জমায় ঐ দোকানটিতে, বিশেষ ক'রে তরুণ তরুণীর দল।

দোকানদারের নাম দ্বিজেন ভাদুড়ী। দ্বিজেন বাবুর সাথে দ্রুততালে সহদেবের আলাপ জমে উঠলো। প্রতিদিন দুটি বেলা সহদেব দ্বিজেনবাবুর দোকানে আসর জমায়। আবশ্যক অনাবশ্যক জিনিষপত্তর খরিদ করে। এম্‌নি ভাবে একটি সপ্তাহের মধ্যে দ্বিজেন বাবুর সাথে সহদেবের ঘনিষ্ঠতা বেড়ে উঠলো।

দোকানের যেদিকটায় লাইব্রেরী সেটা একটা বেশ বড় হল। হলের মাঝে লম্বা টেবিল, তার দুপাশে চেয়ার বসানো।

সন্ধ্যের দিকে বেড়িয়ে ফেরবার পথে অনেকেই সেখানে বসে জটলা করে। বাছাই ক'রে বই নেয়, মাসিক পত্র পড়ে, সাপ্তাহিকের ছবি দেখে। সহদেবও সন্ধ্যায় সেই হলের এক কোণে বসে চুরুট টানে আর এটা ওটা পড়ে। কিন্তু নিজেকে তার কেমন বিশ্রী খাপছাড়া ঠেকে সেই সব তরুণ তরুণীদের মাঝখানে। সে যেন কুণ্ঠিত হ'য়ে ওঠে। ওদের অনর্গল উচ্ছ্বসিত হাসি সহদেবের অপরিচিত। ওরা যেন সহদেবের জগতের নয়। সহদেব কুণ্ঠার চোখ দিয়ে স্তব্ধ বিস্ময়ে ওদের পানে চায়। ওদের প্রাণের জোয়ার এসে সহদেবের বুকে আছড়ে পড়ে। ওদের প্রাণের আলো ছটকে এসে সহদেবের বুকের মাঝে প্রতিবিম্বিত হয়! সহদেব জীবনের আভাস পায়, ওদের মুখে, ওদের হাসিতে, ওদের কথা বলার ভঙ্গীতে, ওদের চলার গতিতে!

সহদেবের চোখে নেশা ধরে, দেহের শিরায় শিরায় রক্তের জোয়ার বয়ে যায়, আবার এক সময় চোখ দুটো জ্বালা ক'রে বাষ্পাচ্ছন্ন হ'য়ে আসে। আস্তে আস্তে সে উঠে বাইরে গিয়ে দাঁড়ায়, আঁধারের আবছায়।

ভাদুড়ী জিগগেস করে, কেমন লাগছে জায়গাটা?

সহদেব ঈষৎ হেসে বলে, মন্দ কি! মনে কচ্চি এই খানেই থেকে যাবো, ছোট খাটো একটা বাঙলো কিনে।

কোথায় কোন্ বাঙলো বিক্রী আছে তার সংবাদ ভাদুড়ীর নখদর্পণে। ভাদুড়ী বলে, বাঙলোর অভাব কি? হুকুম করলেই

ঠিক করে দোব। একটা নতুন বাঙলো বিক্রী রয়েচে, দামেও সস্তা হবে।

সহদেব বলে, আপনার সঙ্গে পরামর্শ না করে কিন্‌বো না। এখনো মন ঠিক করিনি, তবে শরীরও বেশ ভাল থাকচে এখানে, আর আপনার সঙ্গে আলাপ করে এখানে দিনগুলোও একরকম কাটচে মন্দ নয়।

ভাদুড়ী একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বলে, সত্যিই জায়গাটা ভাল। আমারো ভাই প্রাণ কাঁদে জায়গাটা ছাড়তে। ত্রিশ বছর একাদিক্রমে কাটিয়েচি এখানে।

সহদেবের মুখে ফুটে ওঠে বিস্ময়। জিগগেস করে, ছেড়ে যাবেন কেন?

ভাদুড়ী বিমর্ষ মুখে উত্তর দেয়, উপায় নেই। ছেলেটি আমার চাক্‌রী নিয়ে কল্‌কাতায় র'য়েচে। ছেলে, বউ কেউ চায় না যে আমি একলা থাকি এইখানে। আর বউমাটি আমার ভারী মায়াবী। তাঁর স্নেহ-যত্নের আড়ালে থাক্‌তে প্রাণ চায় না। মেয়েটাকে কাছ ছাড়া ক'রে প্রাণটা যেন হাঁপিয়ে ওঠে মাঝে মাঝে।

সহদেবের মুখের চেহারাটা সহসা বদ্‌লে গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে জোরে জোরে চুরুটটায় টান দিতে লাগলো।

ভাদুড়ী বলে, খোকার মার অসুখ। ডাক্তারের আদেশে হাওয়া বদ্‌লাতে তাকে নিয়ে এখানে এলুম। তাকে আর ফিরতে হলো না, এইখানেই সে শেষ নিঃশ্বাসটি ফেল্‌লে। খোকা তখন

মাত্র দু'বছরের। আর দেশে ফির্তে প্রাণ চাইলে না। জীবনের একমাত্র অবলম্বন ঐ ছেলেটাকে নেড়েচেড়েই এই ত্রিশটি বছর কাটিয়েচি। কখনো কাছ ছাড়া করিনি। তাই ভাবচি জীবনের এই অবেলায় আর একলা এখানে পড়ে থাকি কেন?

ভাদুড়ীর চোখদুটো উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো, একটা নিষ্ঠুর ব্যথার ভারে তার বুকখানা ভারী হ'য়ে উঠলো।

স্তব্ধ ঘরের দুঃসহ নীরবতা সহদেবের কানে এক বিচিত্র অপরিচিত বার্ত্তা নিয়ে এলো। সহদেব বাইরে আঁধারের পানে চোখ মেলে দিয়ে অনুচ্চস্বরে বল্লে,—হুঁ!

পাশের লাইব্রেরী হ'তে ভেসে আসে স্ত্রীকণ্ঠের চাপা হাসি। সহদেব সচকিত হ'য়ে ভাদুড়ীর মুখের পানে চায়।

ভাদুড়ী বলে, দোকানটা নিয়ে শুধু বিব্রত হ'য়ে পড়েচি। নিজের হাতে-গড়া, চল্তি দোকান,—

সহদেব চোখদুটি বিস্ফারিত ক'রে জিগগেস করে, দোকানটা কি বিক্রী করবেন নাকি?

ভাদুড়ী উত্তর দেয়, ভাল খদ্দের মিল্চে কৈ! এতবড় দোকান নেবার মতো খদ্দের এখানে জুটচে না।

সহদেব প্রশ্ন করে, মালও আছে অনেক টাকার,—না?

ভাদুড়ী উত্তর দেয়, এমন বেশী কিছু নয়। তবে কি জানেন, এ সহরের এটি সম্পূর্ণ বাঙালী প্রতিষ্ঠান। অবাঙালী খদ্দের অনেকেই আসচে। কিন্তু আমার ইচ্ছে নয় যে এটা অবাঙালীর

হাতে পড়ে। প্রবাসী বাঙালীদের এটি একটি সমিতির মতো। বাঙালী কেউ নিলে, এটি ঠিক এমনিই থাক্‌বে আশা করা যায়, নইলে এর চেহারা বদ্‌লে যাবে দুদিনে—বাজারের আর পাঁচটা দোকানের মতো এও একটা দোকানই থেকে যাবে। এর বিশেষত্বটুকু নষ্ট হ'য়ে যাবে।

সহদেব কোন উত্তর না দিয়ে স্থির হ'য়ে ব'সে রইলো।

চার

দিন দুই পরে।

সহদেব ভাদুড়ীর দোকানে ঢুকেই জিগগেস করলে, ভাদুড়ী মশায় কি সত্যিই তা হ'লে এখান থেকে যাচ্ছেন ?

ভাদুড়ী সবিস্ময়ে সহদেবের মুখের পানে চেয়ে উত্তর দিলে, আজ্ঞে হ্যাঁ, যাওয়া তো ঠিক, কিন্তু এই দোকানের একটা ব্যবস্থা না ক'রে তো যেতে পারছি না।

সহদেব কিছুক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে বসে থেকে জিগগেস করলে, দোকানটা বিক্রী করাও তা হ'লে ঠিক্ ?

ভাদুড়ী উত্তর দিলে, আজ্ঞে হ্যাঁ, তা ভিন্ন আর উপায় কি ?

সহদেব কথা প্রসঙ্গে প্রস্তাব করলো সে নিজেই দোকানটা নিতে চায়, যদি ভাদুড়ী মশায়ের তরফ হ'তে কোন আপত্তি না থাকে।

ভাদুড়ী প্রথমটা বেশ একটু বিস্মিত হলো, কিন্তু শেষে সবিনয়ে উত্তর দিলে, আমার আর এতে আপত্তি কি থাকতে পারে, বরং আপনি যদি নিয়ে আমায় ছুটি দেন তো আমি বেঁচে যাই।

সহদেব অন্যমনস্ক। গাম্ভীর্য্যে মুখখানা ভরে বললে, হ্যাঁ আমি একরকম মন ঠিক্ করেচি। এখানে যদি থাক্‌তেই হয়, একটা কিছু নিয়ে না থাক্‌লে থাকব কেমন ক'রে? তা ছাড়া এখানে এসেই আপনার এই দোকানটার ওপর কেমন একটা মায়া পড়ে গেল। আপনি যখন ছেড়েই দেবেন, তখন এটাকে বেহাত করি কেন?

সহদেব যখন বাইরে যাচ্চে, সেই সময় ভাদুড়ী তার সঙ্গে সঙ্গে রাস্তা পর্য্যন্ত এসে জিগগেস করলে, তা হ'লে আর আমি অন্য কারুর সঙ্গে কথা কইবো না, নিশ্চিন্ত রইলাম?

সহদেব যেন কথাটা ভুলেই গিয়েছিল, এম্‌নি ভাবে তার মুখের পানে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বল্‌লে, ওঃ, দোকানের কথা বলচেন? নিশ্চয়! কথা যখন দিলুম তখন ঠিকই রইল, কাল একসময় ব'সে দামটা ঠিক করা যাবে।

ভাদুড়ী বললে, আমিও মজুত মালের একটা লিষ্টি তৈরী করি—

—বেশ।

সহদেব এগিয়ে গেল। ভাদুড়ী দোকানে এসে বসেচে মাত্র, এমন সময় আবার সহদেব এসে তাকে ডাক দিলে।

ভাদুড়ী বাইরে আসতেই, সহদেব বললে, আমি ভুলে

গিয়েছিলুম, কথা যখন পাকা হ'য়ে গেল তখন কিছু বায়না করাই ভাল। এই নিন পাঁচশো এক টাকা।

টাকাটা ভাদুড়ীর হাতে দিয়েই সহদেব আবার পিছু ফিরলো। ভাদুড়ী বললে, এর জন্যে আবার আপনার ফিরে আসবার দরকার কি ছিলো, আপনার কথাইত যথেষ্ট।

—তা তো ঠিক, তবুও আপনার দিকটা তো আমার ভাবা উচিত, আরো পাঁচটা খদ্দের যখন আসচে।

ভাদুড়ী বললে, একবার তাহলে ভেতরে আসুন না, একটা রসিদ লিখে দিই টাকাটার।

সহদেব বললে, রসিদ নেবার প্রয়োজন বুঝলে, আমি নিজেই বলতুম। সে জন্যে আপনি ব্যস্ত হবেন না। একেবারে একটা লেখাপড়া ক'রে নিলেই হবে।

সহদেব ভাদুড়ীকে কোন কিছু বলবার অবকাশ না দিয়েই এগিয়ে গেল। ভাদুড়ী স্তব্ধ হ'য়ে পেছনে তার পানে চেয়ে রইলো।

কি জানি কেন সহদেব ভাদুড়ীর কাছ থেকে দোকানটা কিনে নিয়ে স্থায়ীভাবে এখানে ব্যবসা সুরু করে দিলে। ব্যবসা করবার জন্যে বা ব্যবসায় লাভবান হবার জন্যে নিশ্চয়ই নয়।

বাঙলো ছেড়ে দিয়ে সে আস্তানা পাতলে এই দোকানের ভিতর। আত্মগোপন ক'রে কলকাতার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী সহদেব সরকার পশ্চিমের ছোট্ট একটা সহরে মনোহারীর দোকানে বসে

ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের বিক্রী করে লজেঞ্জুস, বিস্কুট ও চকোলেট। মেয়েদের বিক্রী করে সাবান, তরল আলতা ও মাথার ফিতে! বিক্রী করে সহদেব, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই সে দাম নিতে ভুলে যায় বা চায় না। তাদের মুখের অনর্গল হাসি, সকৌতুক চাউনি, লীলায়িত অঙ্গভঙ্গী, স্নিগ্ধ হাতের পরশ সহদেবের বিরুদ্ধ মনের কপাট খুলে দেয়, তার নিদ্রিত চেতনাকে উদ্বুদ্ধ, উচ্চকিত করে তোলে! সুগভীর তৃপ্তিতে তার বুকের নীচেটা ফেনিয়ে ওঠে শুধু এই ভেবে যে এরা দয়া করে তার দোকানে আসে। মানুষের মাঝে থেকেও সংসারের আসল মানুষ যারা তাদের থেকে চিরদিন দূরে ছিল তার স্থান! আজ যেন তাদের মাঝে একটু ঠাঁই পেয়ে, তাদের আনন্দের ছোঁয়াচ পেয়ে সে ধন্য হয়ে উঠলো। সুগভীর মনোযোগ দিয়ে তাদের পর্য্যবেক্ষণ করে, তাদের মুখে হাসি ফোটাতে পারলে, সে কৃতার্থ হয়ে যায়।

সহদেব ঠিক এই চেয়েছিল। জীবনের স্বাদ সে কোনদিন পায় নি, তাই সে এমনি একটা আবেষ্টনের মধ্যে দিয়ে জীবনের সাথে পরিচিত হতে চায়। সে চায় মানুষের সঙ্গ, আসল মানুষের অকুণ্ঠ জীবনের সাথে মেলামেশা করে নিজের ছন্দহীন জীবনের মাঝে একটু আনন্দের স্পন্দন! জীবিকার প্রয়োজন তার ছিল না, প্রয়োজন তার জীবনের।

দোকানের মালিক বদলি হলো, দোকান কিন্তু ঠিক পূর্ব্বের মতোই চল্‌তে লাগলো। বরং পূর্ব্বের চেয়ে দোকান আরো জমে উঠলো। সহদেব সদালাপী, মিষ্টভাষী। তার ওপর

দরদস্তুর করে না, ব্যবসার হিসেব রাখে না, লাভ লোকসানের বালাই নেই। নিজের হাতে বিক্রী করতে পারলেই তার আনন্দ। জীবনের উৎসব সভায় সে যেন ফুল সরবরাহ করবার ভার পেয়েচে। মনের মত করে সাজি সাজাতে পারাই তার আনন্দ। আনন্দের সেই চেতনাটুকু বুকের মাঝে নিয়ে মুগ্ধ চোখে সে এই উৎসব সভার পানে চেয়ে চেয়ে দেখে! অতীতের গীতহীন, ছন্দহীন জীবনকে মরীচিকার মাঝে লুপ্ত করে দিয়ে, জীবনে আনতে চায় আনন্দের শোভাযাত্রা, প্রবাহিত রক্তের মাঝে আনন্দময় জীবনের স্পন্দন!

কতো রকমের জিনিষই যে তাকে আমদানী করতে হয়! এখানকার বাঙালীরা চায় প্রতিদিনকার জীবন যাত্রার প্রয়োজনীয় যা কিছু সবই এই একটি দোকান হতে পেতে।

দ্বিতীয় দিন আহারাদি শেষ ক'রে সহদেব বাইরে এসে দেখলে একটি ছোট মেয়ে দোরের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। সহদেব বাইরে এসে জানতে পারলে, সে ভাদুড়ী মশায়কে খুঁজচে। ভাদুড়ী মশায় যে চলে গেছেন একথা জান্‌তে পেরে মেয়েটির মুখখানি নিমেষে শুকিয়ে গেল। সে বিষণ্ণমুখে জিগ্‌গেস করলে, ভাদুড়ী মশায় কি আর আসবেন না?

সহদেব আশ্বাসের গলায় বল্‌লে, না। কিন্তু তোমার কি দরকার আমায় বলোনা?

সহদেব জান্‌তে পারলে, মেয়েটি কিছু চাল ধার চায়।

সত্যিই সে একটু বিব্রত হ'য়ে পড়লো, চাল তো তার দোকানে

বিক্রী হয় না,—তা ছাড়া নিজেরও খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা সে নিজে করেনি, ভাদুড়ী মশায় করে দিয়েছে এক ভদ্র অথচ দরিদ্র পরিবারে। তাঁরাই সহদেবের খাবার দেয়। কাজেই সহদেবের ভাঁড়ারে চাল থাকবে কোথা থেকে!

মেয়েটি ক্ষুণ্ণ হ'য়ে সহদেবের মুখের পানে তাকিয়ে চলে যাচ্চে দেখে সহদেব তাকে জিগ্‌গেস করলে, ভাদুড়ী মশায় কি চাল বেচতেন?

মেয়েটি ভীরু চোখ দুটি একবার সহদেবের মুখের পরে তুলে ধরেই আবার নামিয়ে নিয়ে নীচু গলায় বললে, তা জানি না, তবে আমরা মাঝে মাঝে ধার নিয়ে যেতুম।

সহদেব প্রশ্ন করলে, কতোটা চাল হলে তোমার চল্‌বে?

মুখখানি নীচু করে মেয়েটি বললে, এক সের।

সহদেব জিগ্‌গেস করলে, বাজারে এক সের চালের দাম কতো, জানো?

—জানি। দু' আনা।

সহদেব মেয়েটির হাতে দু' আনা পয়সা দিয়ে বললে, তুমি বাজার থেকে আমার জন্যে এক সের চাল কিনে সেইটে তুমি ধার নিয়ে যাও।

মেয়েটি হাতের মাঝে পয়সাগুলো নিয়ে সহদেবের মুখের পানে বিস্ময়ে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে রইলো।

সহদেব হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে, এতে বোধ হয় তোমার

কোন আপত্তি নেই। যাও, বাজারে গিয়ে চাল কিনে নিয়ে যাও।

মেয়েটির মুখে কথা ফুট্‌লো না, পেছন ফিরে সে তার ময়লা জীর্ণ শাড়ীর আঁচলে চোখ মুছলে।

আনন্দে সহদেবের চোখ দুটোও ভিজে উঠলো। সে স্তব্ধ হ'য়ে রৌদ্রদীপ্ত জনশূন্য পথের পানে চেয়ে রইলো।

পাঁচ

সন্ধ্যায় সহদেবের নিঃশ্বাস ফেল্‌বার অবসর মেলে না। বেড়িয়ে ফেরবার পথে যতো সব তরুণ তরুণী এসে জমা হয় সহদেবের লাইব্রেরীতে বই নিতে। তাদের সাথে বই বাছাই করা, তাদের মাঝে বসে তাদের মুখে বই-এর সমালোচনা শোনা সে এক পরম আনন্দময় চেতনা! সহদেবের সমস্ত শরীরটা পাখার মত হাল্‌কা হ'য়ে ওঠে, উচ্ছ্বসিত আনন্দে হাওয়ায় উড়ে বেড়ায় এঘর হ'তে ওঘরে। গভীর মনোযোগে, সমগ্র চেতনা দিয়ে তাদের মাঝে সে নিজেকে বিলিয়ে দেয়, তাদের তুষ্টি সাধনে প্রয়াস পায়।

পেট্রোম্যাক্স আলোর নীচে ব'সে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এরা জটলা ক'রে। সহদেব দূর হ'তে নির্নিমেষে এদের পানে চেয়ে দেখে। এদের প্রবাসের এই উচ্ছল আনন্দের জোয়ার তার রক্তের মাঝে সঞ্চারিত হ'তে থাকে। ওদের আনন্দের উন্মাদনা তার রক্তের মাঝে এসে পৌঁছায়।

তারপর গভীর রাত্রে যখন সহদেব অবসন্ন দেহটা লুটিয়ে দেয়

বিছানার প্রান্তে, তখন তার মনে হয়, এদের মাঝে থেকে নিজের পিছনের ব্যর্থতার মলিন দিনগুলোকে জীবনের পৃষ্ঠা হ'তে মুছে ফেলা হয়তো শক্ত নয়। এমনি চিন্তার মধ্যে দিয়ে সে ধীরে ধীরে আবিষ্কার করচে তার জীবনের পথ।

সেদিন বিকেল হ'তেই বৃষ্টি নেমেচে। তার ওপর এলো-মেলো ঝড়ো হাওয়া। পথ জনশূন্য। ক্বচিৎ দুএকজন বর্ষাতি গায়ে ছাতি মাথায় দিয়ে দ্রুতপায়ে পথ চলচে। দোকানে লোকজন নেই। সহদেব দোকানের সামনের বারাণ্ডায় বসে চুরুট টান্‌চে আর আকাশবুকে মেঘের লীলা দেখচে। ঝড়ের দাপটে লম্বা একহারা দেবদারু গাছগুলো টলমল কর্‌চে—ইউক্যালিপটসের শুক্‌নো পাতাগুলো বৃষ্টির সাথে ছড়িয়ে পড়চে! দূরে পাহাড়ের চূড়োগুলো মেঘের পর্দা দিয়ে ঢেকে ফেলেচে। বৃষ্টির জলে ধুয়ে পাহাড়ের কালো জঙ্গল বন নীল হয়ে উঠ্‌চে। মাটি ধুয়ে পাহাড়গুলো আকাশের মতই কালো হয়ে উঠচে। আকাশ বাতাস যেন এক হ'য়ে ক্ষেপে উঠচে। গিরিশৃঙ্গগুলো উর্দ্ধমুখে স্বপ্নাবিষ্টের মতো স্তব্ধ হ'য়ে শুন্‌চে আকাশের দীর্ঘশ্বাস! বেলা গড়িয়ে যাচ্চে দ্রুততালে, ঘড়ির চেয়ে দ্রুততর তালে, আলো নিবে যাচ্চে মেঘের চাপে চাপে। কেমন একটা সকরুণ আচ্ছন্নতার মাঝে বসে সহদেব চুরুট টানে আর তাল তাল ধোঁয়া ছাড়ে। মেঘের চাপে যেমন আকাশ আচ্ছন্ন, বৃষ্টির ধারায় যেমন বন-বনান্তর সব সকরুণ তেম্‌নি সহদেবের মনের আকাশও ঘোলাটে ভারী হ'য়ে উঠেচে।

ঝিকিমিকি

সহদেব বারাণ্ডায় এসে বৃষ্টির ঝাপটে খানিকটা ভিজে আবার ভেতরে গিয়ে বস্‌লো। চাকরটা দোকানে সন্ধ্যে দিলে।

দু' একজন ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে সহদেবকে নমস্কার ক'রে চ'লে গেল। সহদেব প্রতিনমস্কার ক'রে উঠে দাঁড়ালো।

কেউ এলোনা দেখে সহদেব ভেতরে গিয়ে বস্‌লো—পেছনে নিজের বস্‌বার ঘরে। চাকর চা দিয়ে গেল।

সহদেব যখন বাইরে এলো, তখন অল্প অল্প বৃষ্টি পড়্‌চে। ঝড়ো হাওয়াটা গেছে থেমে। আকাশে ছেঁড়া পাৎলা মেঘ-গুলো ভেসে বেড়াচ্চে। দু'একজন খদ্দের এলো। সহদেব তাদের বিদায় দিয়ে ভেতরের পানে চেয়ে দেখ্‌লে, লাইব্রেরীর ঘরে একটি মেয়ে ব'সে আছে।

ভেতর থেকে মেয়েটি বললে, সরকার মশায়, বইখানা ফেরৎ দিতে এলুম।

সহদেব নমস্কার ক'রে জিগ্‌গেস করলে, আপনি কতক্ষণ এসেচেন ?

মেয়েটি বল্‌লে, আপনি তখন ভেতরে ছিলেন। বইখানা ক'দিনই পড়ে রয়েচে, তাই ফেরত দিতে এলুম। আর একখানা বই নিয়ে যাবো।

সহদেব বইখানা আলমারীতে রাখতে রাখতে বল্‌লে, আপনি এই ঝড়বৃষ্টির মাঝেও বেরিয়েচেন ?

মেয়েটি আলমারীর কাঁচের মধ্যে দিয়ে বই দেখ্‌তে দেখ্‌তে উত্তর দিলে, কী আর করি বলুন, বিদেশে বেড়াতে এসেও যদি

ঘরের মাঝে বদ্ধ হ'য়ে থাকতে হয়, তাহলে তো নাচার! সমস্ত দিন একা ব'সে ব'সে যেন হাঁপিয়ে উঠেছিলুম, তাই মরীয়া হ'য়ে বেরিয়ে পড়লুম! তার ওপর একখানা বই পর্য্যন্ত নেই যে সময় কাটে!

সহদেব একটা কাজ পেয়ে ও কথা বলবার সঙ্গী পেয়ে যেন হাঁপ্ ছেড়ে বাঁচলো। তার মনের মেঘ গেল পাতলা হয়ে।

মেয়েটি বল্লে, ঘরের মাঝে কোণ্ ঠাসা হ'য়ে থাকতে আমি মোটে পারি না। বিশেষ এই বাদ্‌লা দিনে। খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে যদি মেঘের লীলা না দেখলুম, মুক্ত বাদল হাওয়ায় যদি দেহটাকে না ভেজালুম তবে বাদল দিনটা বৃথাই গেল মনে হয়। বনবনান্তের মত উর্দ্ধমুখে যদি আকাশের পানে হাত তুলে না দাঁড়ালুম তবে আর উপভোগ করলুম কি বৃষ্টির ধারা? বৃষ্টিধারায় যে আকুলতা, যে উন্মাদনা তা যদি দেহের রক্তের মাঝে না পৌঁছাল তবে এর সার্থকতা কি?

সহদেব মুগ্ধ দৃষ্টিতে মেয়েটির মুখের পানে চেয়ে রইলো।

মেয়েটি বল্লে, প্রকৃতির মত্ততার সাথে মানুষের মনের একটা গভীর সম্বন্ধ আছে। প্রকৃতির তালে তাল রেখে মন মেতে ওঠে ঝড়ের বেগে, দীপ্ত হ'য়ে ওঠে রৌদ্রের প্রখরতায়, স্নিগ্ধ হ'য়ে আসে জ্যোৎস্নার বন্যায়! মন চায় স্বাদ পেতে প্রকৃতির সেই সৌন্দর্য্যের!

মৃদু হাসিতে মুখ ভরে সহদেব বললে, আপনি স্বভাব কবি।

আপনার বল্‌বার ভঙ্গীমায় এবং গলার স্বরে এম্‌নি একটী মাধুর্য্য আছে যা ঐ বৃষ্টিধারার ভাষার মতো দুজ্জ্ঞেয় অথচ শ্রুতিমধুর।

মেয়েটি হেসে বল্‌লে, তার মানে আপনি বল্‌তে চান যে আমি আবোল-তাবোল বক্‌চি, যার সুর আছে কিন্তু মানে হয় না। কবি আমি কোনকালেই নই বরং আপনিই কবি।' ঐ যে বললেন না 'বৃষ্টির ভাষা'—চমৎকার! সত্যিই বৃষ্টিধারার ঐ বাণী যখন আমার কাণে এসে পৌঁছাল তখন আর কেউ ধরে রাখতে পারলে না। পথের নির্জ্জনতা নয়, শরীরের মমতা নয়, মস্ত প্রকৃতির মতোই আমি ছুটে বেরিয়ে এলুম বদ্ধ ঘরের জীর্ণ কোণ হ'তে। আপনার ভালো লাগে না, সত্যি বলুন, ঐ বৃষ্টিধারার মুখে দেহটা পেতে দিতে?

সহদেব সহসা উত্তর দিতে পারলে না, একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে মেয়েটির মুখের পানে চাইলে।

মেয়েটির সহদেবের মুখে কি দেখ্‌লে সেই জানে, তবে সে সহসা প্রসঙ্গটা বদ্‌লে নিয়ে বলে উঠ্‌লো, সরকার মশায়, আপনার এখানে মোটেই ভালো বই নেই, যতো রাবিস্‌, সেকেলে বই কতকগুলো। এসব আর আজকাল চলে না।

সহদেব অপ্রস্তুত হ'য়ে উত্তর দেয়, তা ঠিক। নতুন বই আসেনি বহুদিন। আর একে তো ঠিক্ লাইব্রেরী বলা চলে না। বাঙ্‌লা হ'তে যাঁরা আসেন হাওয়া খেতে, সেই সব প্রবাসী বাঙালী ভাইবোন্‌দের সময় কাটাবার জন্যে বই রাখা। আমার তো বই সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই, আপনি···আপনি এক কাজ

করুন না। আমাকে আধুনিক বইয়ের এক্‌টা লিষ্ট তৈরী করে দিন্, আমি এই সপ্তাহেই কলকাতা থেকে আনিয়ে দেব।

প্রস্তাবটী মেয়েটির মন্দ লাগ্‌লো না। সে তার ডাগর চোখ ছু'টি প্রসারিত ক'রে জিগ্‌গেস করলে,—কত টাকার কিন্‌তে পারবেন?

সহদেব গম্ভীর মুখে বল্‌লে, আপনি লিষ্ট দিন্ না—তারপর আপনার কাছ থেকেই জান্‌তে পারবো কতো টাকা দাম লাগবে।

মেয়েটি হেসে বল্‌লে, বাঃ, তাকি হয়! আপনি একটা আন্দাজ দিন্, আমি সেই মত লিষ্ট ক'রে দেব।

সহদেব আম্‌তা আম্‌তা ক'রে জিগ্‌গেস করলে, আন্দাজটা আপনি দিন্ না কতো টাকার বই হ'লে উপস্থিত একরকম চল্‌তে পারে বা যে-সব বই আজকাল লোকেরা খুব পড়ে সেই সব বইগুলো হ'তে পারে।

মেয়েটি একটু ভেবে উত্তর দিলে, তা এখন এ লাইব্রেরীকে আপ-টু-ডেট্ করতে হ'লে অন্ততঃ পাঁচ সাতশো টাকার দরকার।

সহদেব অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বল্‌লে, বেশ, সেই রকমই লিষ্ট করুন।

মেয়েটি কিছুক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো, পরে মুখ নীচু করে বল্‌লে, কিন্তু এটা তো আপনার ব্যবসা সরকার মশায়?

মেয়েটির মুখের দিকে চোখ ছু'টি তুলে সহদেব প্রশ্ন করলে,—কেন?

মেয়েটি উত্তর দিল, এখানে ক'জন লোকই বা পড়ে! তাই ভাবচি এতগুলো টাকা অনর্থক বদ্ধ করবেন?

সহদেব অন্যমনস্কভাবে একখানা মাসিকের পাতা ওল্‌টাতে ওল্‌টাতে বল্‌লে, আপনারা যদি চান্‌, আমায় কর্‌তেই হবে, নইলে আপনারা এখানে আস্‌বেন কেন?

মেয়েটি আবার কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলো।

সহদেব জিগ্‌গেস করলে, আপনি বুঝি খুব পড়েন?

মেয়েটি মুখ নীচু ক'রে উত্তর দিল, খুব না, তবে কিছু কিছু পড়ি নিশ্চয়ই। কারণ পড়ানোই আমার পেশা।

দুর্ব্বোধ্য রহস্যভরা দৃষ্টি দিয়ে সহদেব মেয়েটির মুখের পানে চেয়ে রইলো।

মেয়েটি হেসে বল্‌লে, বুঝতে পারলেন না? বালিকা বিদ্যালয়ে মাষ্টারী ক'রে আমায় জীবিকা অর্জ্জন করতে হয়।

মেয়েটির ঠোঁট্‌ দু'খানি মৃদু কেঁপে উঠলো, আরক্ত মুখখানি ঈষৎ ঝুঁকে পড়লো।

সহদেব কুণ্ঠিত কৌতূহলী দৃষ্টি দিয়ে মেয়েটির আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ ক'রে জিগ্‌গেস করলে, আপনার আর কেউ নেই?

পিছন দিকে মাথাটা একটু সরিয়ে নিয়ে মেয়েটি বল্‌লে, ও কথা জিগ্‌গেস করুচেন কেন? স্বাধীনভাবে নিজের জীবিকা অর্জ্জন করি ব'লে?

সহদেব সঙ্কুচিত হ'য়ে উঠ্‌লো। দ্বিধায় ও কুণ্ঠায় তার মুখে কথা ফুট্‌লো না।

চৌত্রিশ

ছয়

সহদেবের কালো চৈতন্যের পটে একটা উজ্জ্বল ছাপ রেখে মেয়েটি বাদল রাতের স্যাঁতসেঁতে অন্ধকারে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। মেয়েটিকে আরো দু'একবার সহদেব দেখেচে তার লাইব্রেরী ঘরে, কিন্তু এমন ভাবে চোখে পড়েনি কোনোদিন—বোধ হয় সুযোগ হয়নি ব'লেই চোখে পড়েনি। দেখাদেখির একটা স্থানকাল বোধ হয় আছে। তারই অপেক্ষায় চোখ দু'টো হয়তো তার অন্ধ হয়েছিল। বাদল সন্ধ্যার সেই শুভ লগ্নটিতে আকস্মিক বিদ্যুৎ-রেখার মতোই তীব্র হ'য়ে তার চোখের সাম্‌নে মেয়েটি উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠ্‌লো। তার অন্ধকার মনের মাঝখানে একটা গভীর ছাপ পড়ে গেলো। পরিচয়ের সূত্রপাতেই মনে হলো যেন এ অনেক দিনের চেনা। এ তো নতুন নয়, এ ছিল মনের আকাশে, অন্ধকারের গোপনতায়—হঠাৎ চকিতে ফুটে উঠ্‌লো নির্দ্দিষ্ট দিনের নির্দ্দিষ্ট মুহূর্ত্তটিতে! অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে যাকে সে খুঁজে মরছিল, হঠাৎ বিদ্যুতের আলো যেন তাকে আবিষ্কার ক'রে দিলে।

সমস্ত রাত ধ'রে সহদেব ভাবলে তারই কথা,—চপল পাখীর মতো কথা বলার ভঙ্গীমা, স্নিগ্ধ হাসিমাখা মুখখানির প্রসন্নতা, টানা চোখের দীপ্তি। কণ্ঠের বাণীতে কেমন একটী 'মধুর অথচ তেজস্বী দৃপ্তি! সহদেবের মনে হ'লো মেয়েটির কণ্ঠস্বরে এম্নি একটি অপূর্ব্ব স্বাদ আছে যা সহজে ভোলা যায় না।' মনের মাঝখানে যার সুর অনুরণিত হ'তে থাকে সর্ব্বক্ষণ!

মেয়েটির নাম ললিতা।

ললিতাকে প্রথম প্রথম সহদেবের রহস্যময়ী মনে হয়েছিল, কিন্তু যতোই অপরিচয়ের আড়াল ভেঙ্গে দু'জনে কাছাকাছি হ'তে লাগলো, ততই সহদেবের মনে হলো মেয়েটি স্পষ্ট, অতিরিক্ত স্পষ্ট, তাকে বোঝবার জন্যে এতটুকু কষ্ট কর্‌তে হয় না, সে আপনা আপনিই নিজেকে প্রকাশ ক'রে দেয়।

কুড়ি বাইশ বছর হ'লে কি হবে, স্বভাব তার নিতান্ত বালিকার মতই সরল। মুখখানি নধর, সে মুখে গোপনতার ছায়া নেই, ইঙ্গিত নেই। ডাগর দুটি চোখ, পদ্মপলাশের মতো—গভীরতায় অচঞ্চল! সে চোখে অগাধ মমতা, অপরিমিত শ্রদ্ধা! অন্তরের ভাষাটি চোখ দুটিতে সুপ্রকাশ! নিজের জীবন সম্বন্ধে সে কিন্তু ভারী উদাসীন, ভারী নির্লিপ্ত!

প্রতিনিয়ত ললিতা আসে সহদেবের দোকানে। লাইব্রেরীর মাঝে ব'সে পড়াশুনো করে, সহদেবের সাথে গল্প করে।

সহদেবের কাছে নারী ছিল চির অপরিচিত, দুর্জ্ঞেয় রহস্য-ভরা। চোখ দিয়েই চিরদিন নারীকে দেখে এসেচে সে, মন দিয়ে

দেখবার অবসর কখনো ঘটেনি। কিন্তু এই যে মেয়েটি ললিতা, এ যেন ক'টি দিনেই সহদেবকে একান্ত আপন ক'রে তুল্‌লো, তার সযত্ন স্নেহ দিয়ে, মমতা দিয়ে ; তার নিঃসঙ্গ আঁধার জীবনে হাসির হিল্লোল তুলে। তার সারা জীবনের নির্ব্বাসিত আনন্দকে যেন এই মমতাময়ী মেয়েটি দুহাত প্রসারিত ক'রে ফিরিয়ে আন্‌তে চায়—নিরানন্দ মূক জীবনকে তার নিজের আনন্দ দিয়ে মুখর ক'রে তুল্‌তে চায়।

খোদ্দেরের ভিড় কেটে গেলে, সহদেব সেদিন ঘরে ঢুকে দেখলে ললিতা লাইব্রেরী ঘরের এক কোণে বসে কি-সব খাতাপত্র দেখচে।

সহদেব তার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই, ললিতা চোখ তুলে তার মুখের পানে চেয়ে বল্‌লে, এতগুলো টাকার বই তো আনালেন সরকার মশায়, কিন্তু চাঁদার খাতায় দেখলুম চাঁদা তো আদায় হয় না মোটেই, অনাদায়ের সংখ্যাই তো বেশী।

সহদেব যেন আকাশ হ'তে পড়লো, এম্‌নি মুখের ভাবটা ক'রে বলে উঠ্‌লো, লাইব্রেরীর চাঁদার একখানা খাতা আছে নাকি ? তা তো জানি না।

ললিতা তো হেসে কুটিকুটি।

সহদেব মুগ্ধ বিস্ময়ে তার মুখের পানে চায়।

একসময় ললিতা বলে, ভাল ব্যবসা করচেন তো সরকার মশায় ! দোকানের হিসেব পত্রের খাতা আছে, না, তাও জানেন না ?

সহদেব হেসে উত্তর দেয়, তুমিও যেমন, ঐ হিসেব পত্রের ঝঞ্ঝাট করতে গেলেই আবার একজন সরকার রাখতে হয়। সে আবার একটা বাজে খরচ।

ললিতা বাঁকা চাউনিতে হাসি ফুটিয়ে বলে, তা মন্দ নয়।

সহদেব বলে, একলা মানুষ, অতো ঝঞ্ঝাট পারবো কেন? তার চেয়ে মানুষকে বিশ্বাস করাই ভালো।

ললিতা নিঃশব্দে কেমন এক অদ্ভুত দৃষ্টি দিয়ে সহদেবের মুখের পানে চায়। সহদেব ছেলেমানুষের মতো খিল্ খিল্ ক'রে হাসে।

ললিতা একসময় বলে, আমাকে মাইনে দিয়ে রাখুন না, তা হ'লে না হয় আমি এখানে থেকে যাই।

সহদেব সঙ্কুচিত হ'য়ে বলে, তোমাকে? তোমাকে মাইনে দিয়ে রাখ্‌বার মতো শক্তি বা স্পর্দ্ধা আমার নেই।

ললিতা হেসে বলে, নিশ্চয়, বাজে খরচ হবে।

ললিতা লক্ষ্য করে অকারণে মাঝে মাঝে সহদেবের মুখের রেখায় কেমন একটা বিষণ্ণতা ফুটে ওঠে। সে স্তব্ধ বিস্ময়ে তাঁর পানে চেয়ে থাকে, বুঝ্‌তে পারে না কিসের এই ব্যথা, অথচ এটুকু সে বুঝ্‌তে পারে যে একটা নিষ্ঠুর ব্যথা তাঁর বুকের এক কোণে বিঁধে আছে; আর তারি নিদারুণ যন্ত্রণা তাকে অধীর করে তোলে।

ললিতা একদিন নিরালায় সহদেবকে বলে, দেখুন সরকার মশায়, আপনার মুখ দেখে মনে হয় আপনার মনের মাঝে অনেক

কথা জমা হ'য়ে আছে, আর সেই সব কথা বলবার জন্যে আপনি মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে ওঠেন, অথচ বলেন না—

সহদেব প্রসারিত দৃষ্টি দিয়ে ললিতার মুখের পানে চায়।

ললিতা সস্নেহ কণ্ঠে জিগ্‌গেস করে, কেন বলেন না? বল্‌বেন না?

সহদেব চুপ ক'রে থাকে। কী যে উত্তর দেবে ভেবে পায় না!

ললিতা ভ্রূকুটি ক'রে চোখের ইঙ্গিতে তাকে শাসায়।

ললিতার মুখের আলোয় সহদেবের দৃষ্টি প্রখর হ'য়ে ওঠে। তার মনে হয় ললিতার এ নিঃশব্দ আহ্বানকে বুঝি বা উপেক্ষা করা চলে না। হঠাৎ সে একটা পাগলামী ক'রে না বসে। কিন্তু সঙ্কোচ তাকে আড়াল ক'রে দাঁড়ায়।

আধ-আঁধার ঘরের মাঝে দুজনে পাশাপাশি অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে রইলো। একসময় সহদেবের মুখের দিকে মুখ তুলে ললিতা বল্‌লে, একদিন কিন্তু শুন্‌বোই আপনার মনের কথা। আজ না হয় রেহাই পেলেন, কিন্তু প্রস্তুত হ'য়ে থাক্‌বেন, শোনাতেই হবে একদিন আপনার কথা।

ললিতা তার রূপের মাধুর্য্য ছড়িয়ে হেল্‌তে দুল্‌তে চলে যায়, সহদেব নিঃশব্দে তাকে অর্দ্ধেক রাস্তা পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসে।

ললিতা একসময় বলে, আর আস্‌বেন না আপনি, ঠাণ্ডা লাগ্‌বে।

উনচল্লিশ

সহদেব থমকে দাঁড়ায়। রাত্রির পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকারে নিমেষে ললিতা অদৃশ্য হ'য়ে যায়।

ঘরের মাঝের অখণ্ড রিক্ততা সহদেবকে বিব্রত ক'রে তোলে, ললিতার আসতে দেরী হ'লে সে হাঁপিয়ে ওঠে—উদ্বেগে আশঙ্কায় কেমন যেন ছটফট করতে থাকে। ললিতা আসে, তার মর্ম্মরিত আনন্দে, লীলায়িত অঙ্গভঙ্গীতে ঘরটি ভরে যায়। সহদেব স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, নিশ্চিন্ত আরামে তার কাছটিতে ব'সে গল্প করে। কত সে কথা, ললিতা অনর্গল ব'কে যায়, সহদেব বিস্মিত পুলকে তার মুখের পানে চেয়ে থাকে। ললিতার প্রসন্ন মুখের শুভ্র হাসি, স্নেহ-সজল চোখের চাউনি সহদেবের মনের কন্দরে এক অপরিচিত পুলকের বার্ত্তা নিয়ে এসে দাপাদাপি সুরু করে।

সহদেবকে বসিয়ে রেখে ললিতা পাশের ঘরে গিয়ে ষ্টোভ জ্বেলে চা তৈরি করে, সহদেব সতৃষ্ণনয়নে চেয়ে চেয়ে দেখে তার প্রতিটি অঙ্গসঞ্চালন, যেন পদ্মের দলের মত তারা বিকশিত হচ্চে একটির পর একটি। তার সুগঠিত অনাবৃত বাহুটি নাচ্‌তে থাকে চায়ের টেবিলের ওপর, সহদেবের মনের আকাশে চমক লাগে। ললিতার অসম্বৃত ঘন চুলের সুবাসে ঘরের বাতাস ভারী হ'য়ে ওঠে, সেই হাওয়া গায়ে লেগে সহদেবের সমস্ত শরীরটা দুলে দুলে ওঠে; তার দেহের আলো সহদেবের রক্তের মাঝে প্রবেশ ক'রে তার শিরায় শিরায় সঞ্চারিত করে এক অভিনব উত্তেজনা। অতীতের ভগ্নস্তূপের মধ্য হ'তে জেগে

উঠে সহদেব, নিজেকে দেখ্‌তে পায় বাস্তবরূপে, আর পাঁচজনের মতো এই রূপ-রস-গন্ধে ভরা সংসারের মাঝে।

সহদেবের বয়স হ'য়েচে, কিন্তু বয়স তার দেহকে শিথিল করেনি। সারাজীবনের সংযম তার মনকে যেমন অসামান্য শুভ্রতা দিয়েচে, দেহ হ'তে তেম্‌নি নিশ্চিহ্ন ক'রে মুছে ফেলতে পারেনি যৌবনের প্রভাব। অস্ত গেলেও এখনো গোধূলির স্তিমিত আলোর মতো যৌবন ছুঁয়ে আছে তার দেহের আকাশ। অন্ধকার নিবিড় হ'য়ে এখনো তার মনের আলোকে অদৃশ্য করতে পারেনি। তাই ললিতার আকস্মিক আবির্ভাব মাঝে মাঝে চঞ্চল হাওয়ার মতো তার মনটাকে এলোমেলো ক'রে দিয়ে যায়।

•

সাত

ললিতার বাড়ী সহদেবের মধ্যাহ্ন ভোজনের নেমন্তন্ন; ললিতা নিজের হাতে রেঁধেচে।

আয়োজনের ঘটা দেখে সহদেব বিস্মিত হ'য়ে বল্‌লে, বি, এ পাশ মেয়ে যে এমন রান্না করতে পারে এ আমার ধারণাই ছিল না।

ললিতা সাড়ীর আঁচলে মুখ মুছতে মুছতে উত্তর দিলে, তবে কি আপনার মতে বি, এ পাশ করলে মেয়েরা পুরুষ হয়ে যায়?

সহদেব হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে, তা ঠিক্ নয়। তবে বি, এ পাশ করা মেয়েরা চা তৈরি কর্‌লে কিংবা বড় জোর দু'খানা মাম্‌লেট্ ভাজলে। তারা যে এমন ডাল্‌না, চচ্চরি রাঁধবে এ আমি ভাবতেও পারি নি।

—যাক্, তবু ভাল যে বি, এ পাশ মেয়েদের সম্বন্ধে ধারণাটা আপনার বদ্‌লে গেল।

সহদেব দু'আঙুলের মাঝে সিগারেটটা টিপে ধ'রে ছাই ঝাড়তে

ঝাড়্তে বল্‌লে, বি, এ পাশ মেয়েদের সম্বন্ধে ধারণা না বদ্‌লালেও, অন্ততঃ তোমার সম্বন্ধে ধারণাটা বদ্‌লে গেলো।

ললিতা দাঁতে ঠোঁট চেপে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে, কিন্তু আমার সম্বন্ধে আপনার অমন উল্টো ধারণাটা জন্মালো কেমন ক'রে আমি শুধু তাই ভাব্‌চি।

সহদেব বল্‌লে, উল্টো কেমন ক'রে, আমার তো মনে হয় ঐটেই স্বাভাবিক, সাধারণ হ'তে ঐটুকুই তার স্বাতন্ত্র্য।

—ওই ডাল্‌না, চচ্চরি না রাঁধা ?—ললিতা উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলো।

সহদেব দম্‌লো না। বল্‌লে, শুধু কি তাই? সেবার প্রবৃত্তিটাও আমার মনে হয় তাদের মন থেকে অলক্ষ্যে উবে যায়। জ্ঞানের চর্চ্চায় তাদের মনের কোমল বৃত্তিগুলো সব কঠিন হ'য়ে যায়। সেগুলোর চর্চ্চা করবার অবসর পায় না তারা কোন-দিন। চাষ না ক'রে তো তুমি ফসলের আশা কর্‌তে পারো না।

ললিতা বিস্ময়ে ডাগর চোখ দু'টি প্রসারিত ক'রে বললে, তার মানে আপনি বল্‌তে চান যে জ্ঞানের চর্চ্চা ক'রে মেয়েরা স্ত্রী বা মা হবার অযোগ্য হয়ে যায় ?

সহদেব মাথা নাড়তে নাড়তে বল্‌লে, একরকম তাই বইকি, অন্ততঃ আমাদের দেশে। স্ত্রী বা মা হবার উপযোগী যে জমীটুকু, এ দেশের মেয়েদের মনের মাঝে সেইটুকুই সব চেয়ে কোমল। সে জমীটুকু সময়ে আবাদের অভাবে যদি পোড়ো জমীর মতো

কঠিন ও শুক্‌নো হ'য়ে যায়, তবে সে নারী স্ত্রী বা মা হবার অযোগ্য।

কিছু না ব'লে ললিতা হাস্‌লে।

সহদেব জিগগেস করলে, হাস্‌লে যে ?

ললিতা সাড়ীর আঁচলটা কাঁধের ওপর গোছাতে গোছাতে বল্‌লে, আপনার গভীর গবেষণা শুনেও গম্ভীর হ'তে পারলুম না। ওটা আমার একটা বদ্ অভ্যেস্।

সহদেব জিগগেস করলে, কথাটা বুঝি মনে ধরলো না ?

ললিতা বল্‌লে, যা সত্যি নয় তা মনে ধরবে কেমন করে ? স্ত্রীতত্ত্ব সম্বন্ধে আপনার মোটেই অভিজ্ঞতা নেই। আপনি স্ত্রী শিক্ষার বিরোধী ব'লেই এ কথা বল্‌চেন। নইলে সত্যি কথাটা হচ্চে এইঃ নারী হ'য়ে যে জন্মেচে সে চিরদিনই নারী, যতই সে লেখাপড়া শিখুক আর যতোই সে বাইরে পুরুষের সাথে মেলামেশা করুক। নারী হ'য়ে যেদিন সে সংসারের আলো দেখেচে সেইদিনই হ'য়েচে সে মা, সেইদিনই হ'য়েচে সে স্ত্রী। ভোরের আলো যেমন, যতোই স্পষ্ট হোক্, তীব্রোজ্জ্বল সে হ'তে পারে না তেম্‌নি নারী চিরদিনই নারী, জ্ঞানচর্চ্চা ক'রে যতই কেন মনটাকে বোঝাই করুক না, তবুও সে পুরুষ হবে না। ঘোম্‌টা তার মুখ না ঢাক্‌লেও মনকে তার ঢাকবেই একদিন। নইলে সৃষ্টির অপমান করা হবে। দেহকে নতুন নতুন পোষাক পরাতে পারেন, কিন্তু তাঁর সৃষ্টিকে কিংবা স্বভাবের নিয়মকে বদ্‌লাতে পারেন না।

সহদেব অবনত মুখে ব'সে রইলো। ললিতাও উদ্‌গ্রীব হ'য়ে তার উত্তরের আশায় থম্‌কে দাঁড়াল। উত্তর কিন্তু এলো না। ললিতাই আবার প্রশ্ন কর্‌লে, আচ্ছা সরকার মশায়, আপনি বুঝি স্ত্রী শিক্ষার বিরোধী?

সহদেব যেন ঘুম থেকে জেগে উঠে উত্তর দিলে, মোটেই না, তবে স্ত্রী শিক্ষা কেন, স্ত্রীলোক সম্বন্ধে আমি মাথা ঘামাই নি কোনদিন, তারা আমার কাছে দুর্ভেদ্য রহস্য।

ললিতা জিগ্‌গেস করলে, আপনার স্ত্রীও ছিলেন আপনার কাছে রহস্যময়ী?

—স্ত্রী আমার ছিল না কোন দিন। সে সৌভাগ্য আমার হয় নি।

ললিতা প্রচণ্ড বিস্ময়ে চোখ দু'টি বিস্ফারিত ক'রে সহদেবের পানে চাইলে। অপরাধীর মত সহদেবের মুখখানা আরক্ত হয়ে উঠে মুহূর্ত্তে পাংশু হ'য়ে গেল। মুখের রেখায় ফুটে উঠলো অব্যক্ত কাতরতা। ললিতার কৌতূহলী দৃষ্টির নীচে সহদেব হাঁপিয়ে উঠলো। সহদেবের মুখের ভাবে ললিতার মনে হলো, লোকটা জীবনে অনেক দেখেচে, অনেক কিছু শিখেচে, কিন্তু জীবনে পায়নি সে কিছুই। এই নাপাওয়ার ব্যথাটাই সহদেবের মুখের রেখায় রেখায় অঙ্কিত হ'য়ে উঠেছে। সেই ব্যথার ছায়া ললিতার মুখখানিকেও বিষণ্ন করে তুল্‌লে, কিন্তু সেই বিষণ্নতার মাঝে এম্‌নি একটি স্বচ্ছন্দ শান্তির ভাব ফুটে উঠলো যে সহদেব বিস্ময়ের আতিশয্যে নির্ব্বাক হয়ে

গেল। সহদেব জীবনে অনেক সুন্দরী মেয়ে দেখেচে কিন্তু এমন শান্তির রূপ কখনো তার চোখে পড়েনি! ললিতা রূপসী নয়, তবুও সে সুন্দরী—অপরূপ মাধুর্য্য তার চোখের স্নিগ্ধোজ্জ্বল তারা দুটিতে।

ললিতার মুখের পানে চেয়ে সহদেবের চোখ দু'টো কেঁপে কেঁপে সহসা সজল হয়ে উঠ্‌লো।

ললিতা বোধ হয় লক্ষ্য করলে, তাই তাকে সামলাবার অবকাশ দিয়ে সে ত্রস্তপদে বাইরে যেতে যেতে বল্‌লে, আপনি একটু বসুন, আমি খেয়ে আসচি এখুনি।

খাওয়া দাওয়া সেরে ললিতা এসে দেখলে, সহদেব নিঝুম হ'য়ে তার বিছানার ওপর শুয়ে আছে। ঠিক বোঝা গেল না সে ঘুমিয়েছে কি জেগে আছে। ললিতা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে তার মুখের পানে চেয়ে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো, যদি ঘুমিয়ে থাকে এই ভেবে তাকে সে ডাক্‌লে না। ঘরের মাঝে সে পায়চারী ক'রে বেড়ালো কিছুক্ষণ, তারপর একখানা চৌকি টেনে নিয়ে ঘরের এক কোণে স্থির হয়ে বসে রইলো। সহদেবকে কেন্দ্র ক'রে রাশি রাশি চিন্তা এসে তাকে অভিভূত করে ফেললে।

ললিতার মনে হলো, এই লোকটি প্রথম পরিচয়ের দিনটী হতেই যেন তাকে আকর্ষণ করেচে আনন্দে, বেদনায়। কেন? সে নিজেই ভেবে উঠ্‌তে পারে না, অথচ অস্বীকার করতেও পারে না। চিরদিন সে সংযমী, অন্তরের চঞ্চলতাকে সে কোন

দিনই প্রশ্রয় দেয়নি। পুরুষের সঙ্গে মেলামেশায় সে অভ্যস্ত কিন্তু অসতর্ক নয় সে কোনদিনই। কোন পুরুষ সহসা তার জীবনকে এলোমেলো করে দিতে পারে না, এই ছিল তার অহঙ্কার। কত পুরুষ তাদের অটুট যৌবন, ভুবনমোহন রূপ নিয়ে তার চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েচে, তার অন্তরে উচ্চাশার বাণী বিঘোষিত ক'রেচে—কিন্তু ললিতা তাদের পরিহাস করেচে চিরদিন। একজনও তার মনের মাঝে ছাপ রেখে যেতে পারে নি। সেও কারুর জন্যে বেদনা উপলব্ধি করেনি, কারুর জন্যে দীর্ঘশ্বাস ফেলে নি। কিন্তু এই লোকটীর সাথে পরিচয়ের সূত্রপাতেই ললিতা বুঝেছিল যে ওর ওই হাসির অন্তরালে একটা গভীর বেদনা প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। সেই বেদনাটুকুকে সে উপেক্ষা করতে পারলে না, নিজের অন্তরের ব্যথা দিয়ে সেই বেদনাটুকুকে সে গ্রহণ করলে। এবং পরিচয় যতো ঘন হয়ে উঠতে লাগ্‌লো ততই সে তার নিজের প্রাণের মমতা ঢেলে দিয়ে সহদেবের নাপাওয়ার ব্যথাকে নিশ্চিহ্ন ক'রে মুছে দিতে চাইলে। তার জন্যে সে অনুতাপ করেনি একটি দিনও বরং তার মুখে হাসি ফুটিয়ে সে আনন্দই পেয়েছে।

তাই সহদেবের এই আকস্মিক ভাবান্তর আজ ললিতাকে ব্যথিত ও কৌতূহলী করে তুললে। ললিতা যদি জান্‌তে না পারে সহদেবের অন্তরের কথা,—কিসের ব্যথা, কাকে না পাওয়ার ব্যথা তার অন্তরে পুঞ্জীত হ'য়ে আছে, কেমন করে ঘোচাবে সে তার এই নিঃস্বত্ব।

ললিতা অপলক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সহদেবের মুখের পানে চেয়ে রইলো। সে তাকে আজ জানতে চায় পরিপূর্ণভাবে, জানবার মতো অনেক কথাই আছে তার অন্তরে পুঞ্জীভূত হয়ে।

ললিতা ভুলে গেল তাদের বয়সের পার্থক্য। প্রাণের সমস্ত দরদ দিয়ে, প্রিয়তম বান্ধবীর মত সে সাগ্রহে শুনলে সহদেবের জীবনের রোমান্স, সেই তার প্রথম যৌবনের ভালবাসার ছোট্ট কাহিনীটা। তারপর সারাজীবন সে একা, সে নিঃসহায়! ঐশ্বর্য্যের স্তূপের ওপর বসেও সে নিঃস্ব।

সহদেবের চোখে এল জল, বলতে পাওয়ার আনন্দে। একদিন এ সৌভাগ্যও তার হয়নি, শোনাবার লোক মেলে নি।

ললিতারও চোখের পিছনে অশ্রুর ধাক্কা! সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালো। সহদেব জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দিয়ে তার মুখের পানে চাইলো ললিতা বল্‌লে, আপনি একটু বসুন, আমি চা নিয়ে আসি। তারপর দুজনে একসঙ্গে বেরোবো।

ললিতা চলে গেলে। সহদেবের মনে হলো, ললিতা যেন অকস্মাৎ বিকশিত হ'য়ে উঠেছে। পাপ্‌ড়ী খুলে রূপ তার ঝল্‌মল কর্‌চে। শুভ্রতায়, শুচিতায় সে রূপ সহদেবের চোখ দিল ধাঁধিয়ে। নারীকে সে সম্ভ্রমের চোখে দেখে এসেচে চিরদিন, কিন্তু এতখানি শ্রদ্ধা আদায় করতে পারেনি আর কোন নারী তার কাছ হতে।

সহদেবও চায়, এই মেয়েটির সান্নিধ্য। একে সম্বল করেই সে জীবনকে নতুন ক'রে গড়ে তুল্‌তে চায়। তার দু'কুল ভাঙা জীবন-নদীতে যদি ঐ মেয়েটি পাল তুলে পাড়ি দেয়, তবে সত্যিই তার এই জীর্ণ-দেহে আবার রক্তের জোয়ার বইবে। জীবনের এই গোধূলিতেও অস্তরাগের আলোর মতো ললিতা তার হৃদয়াকাশে সমারোহের সৃষ্টি কর্‌বে।

দু'হাতে দু'পেয়ালা চা নিয়ে ললিতা ঘরে ঢুক্‌লো। সহদেব দেখলে তার মুখের পানে চেয়ে। সেখানে আলোর প্রখর প্রকাশ, ক্ষীণ রশ্মিরেখা নয়।

কারুর মুখে কোন কথা নেই, সাম্‌নাসাম্‌নি ব'সে দুজ'নে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দেয় এবং করুণ চোখে পরস্পরের মুখের পানে চায়। ভাষা যেন তারা হারিয়েছে, খুঁজে পাচ্ছে না সেই ভাষাটি যা নিয়ে তারা সুরু কর্‌তে পারে। সহদেব আভাহীন আতুর চোখে ললিতার মুখের পানে চেয়ে থাকে। চোখের ভাষায় গভীর নৈরাশ্য, এই কথাটাই যেন শুধু প্রকাশ পায় যে সারাজীবনটা তার ব্যর্থ হ'য়ে গেছে—এই বাক্যময়ী বিপুলা পৃথিবীতে সেই শুধু একা, তার বল্‌বার মতো জীবনে কিছু নেই, কোন কিছু ঘটেনি।

আর ললিতা—

ললিতার চোখে বিশ্বের করুণা। কি-একটা কথা বল্‌বার জন্যে মন তার অশান্ত হ'য়ে উঠেচে অথচ বল্‌বার সাহস হচ্ছে না, বল্‌বার ভাষা খুঁজে পাচ্চে না সে—

"মানুষের নিজের অজ্ঞাতে কখন্ যে কার ডাক এসে অন্তরকে মথিত ক'রে তোলে তার ঠিকানা পাওয়া যায় না। সে-ডাকে মন তার সাড়া দেবে কিনা তাই ভেবে সে আকুল হ'য়ে ওঠে। তার মীমাংসা করতে করতে শেষে মন যখন গড়িয়ে যায় সেই দিকে তখন সে বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়ে ভাবে, কেমন ক'রে মন তার এ পথে এসে ভিড়লো?—এর ডাক কেমন ক'রে তাকে আকুল ক'রে তুল্‌লো?

ললিতার মনের অন্দরে ঠিক্ এম্‌নি একটা সমস্যা! সে তার জীবনের পাথেয়, তার সঙ্গতি, তার নারী জীবনের সকল গৌরব হারাতে বসেছে—আর ঐ লোকটা দু'হাত প্রসারিত ক'রে নিঃশেষে তার সমস্ত সম্পদ বুক ভরে নেবার জন্যে সাগ্রহে অপেক্ষা কর্‌চে।

সহদেবের ক্ষুব্ধ, বিমূঢ় মুখের পানে চেয়ে ললিতার মন কিন্তু বেদনায় রক্তহীন হ'য়ে ওঠে। সেই নিঃশব্দতার অন্তরালে কাকুতিতে মন তার কলরব ক'রে ওঠে। অপরিচয়ের পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে সে নিঃস্ব হ'য়ে ছুটে যেতে চায় সহদেবের কাছে।

সহদেবের এই জাগরণ অস্বাভাবিক কি না জানি না, কিন্তু অদ্ভুত! অনন্ত সুপ্তির মাঝে যে চেতনা চিরদিন সমাধিস্থ হয়েছিল, সেই চেতনাকে ললিতা যে কেমন ক'রে জাগ্রত ক'রে তুল্‌লে তাই ভেবে বিস্ময়ে এবং ততোধিক্ লজ্জায় সে অভিভূত হ'য়ে পড়ে।

অন্তরের মাঝে সুপ্ত দানব প্রচণ্ড রক্তপিপাসায় সহসা জেগে উঠে ললিতাকে গ্রাস করতে চায়।

দুঃসহ নিঃশব্দতা ভেঙ্গে সহদেব একসময় প্রশ্ন করলে, ললিতা, তুমি কখনো কাউকে ভালোবেসেচো?

একাদশ

আট

ললিতা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো। দীপ্ত চোখ সহদেবের মুখের ওপর রেখে ব'ললে, একথা জিগ্‌গেস কর্‌চেন কেন সরকার মশায়?

—আমার জীবনের কথাটুকু যেমন তুমি জেনে নিলে, তেম্‌নি আমারো জান্‌তে ইচ্ছে করে ললিতা তোমার মনের কথাটি। তাছাড়া আমার জীবনের ঐখানেই মস্ত একটা ফাঁক।

ললিতার বুকের নীচেটা ফুলে ফুলে উঠ্‌লো, মুখ দিয়ে কথা বেরোলো না।

সহদেব অকুণ্ঠিত আবেগে বল্‌লে, ভালোবাসার কথা শুন্‌তে কে চায়না ললিতা, কার না আগ্রহ হয়, বিশেষ তোমাদের কাছে। সারা পৃথিবীকে ডেকে শোনাতে ইচ্ছে করে, ভালোবাসার কাহিনী। শোনাচ্ছে, শুনে আস্‌ছে, সকলেই যুগযুগান্ত ধ'রে ঐ কাহিনী। কাব্যের প্রাণ ঐ কাহিনী, কত গাথা, কত গানই যে রচিত ঐ কাহিনীকে ভিত্তি ক'রে—

ললিতার মন বল্‌লে, সত্যি, সত্যি, জীবনে সত্যি শুধু ঐ

ভালোবাসা, সত্যি যেমন মৃত্যু! মুখে বললে, আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছি, কিন্তু তাই ব'লে আপনার সঙ্গে ওসব আলোচনা করতে অশোভন ঠেকে; কারণ আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি—ভক্তি করি।

নিজের বুকের শূন্যতা পূর্ণ করতেই সহদেবের ও-কথার অবতারণা, কিন্তু এরপর আর সহদেব বলবার কিছু খুঁজে পেলে না, দিশেহারার মতো ললিতার মুখের পানে চেয়ে চোখ দুটি নামিয়ে নিলে। আর অনুরোধ করল না।

সহদেবের আতুর চোখের অপরাধী দৃষ্টি কিন্তু ললিতার মর্ম্মের আকাশ জুড়ে দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠলো। অশান্ত অধীর মন নিয়ে সহদেবের সামনে ব'সে থাকা তার পক্ষে দুর্ব্বহ হয়ে উঠলো।

সহসা একসময় মর্ম্ম-যন্ত্রণায় অধীর হ'য়ে ললিতা জিগ্‌গেস করলে, আপনি কি ভাবচেন বলুন তো?

—ভাববো কি? কিছুনা।

—কিছু ভাবচেন না? সত্যি বলুন—

—না।

অভিযোগের ধারালো কাঁটা নিয়ে কথাটা এসে ললিতার বুকে বিঁধলো, তীক্ষ্ণভাবে।

ললিতা সহদেবের ব্যথিত মুখের পানে চাইলে অপার বিস্ময়ে!

কিছুক্ষণ পরে নিম্নস্বরে অনুযোগ করলে, ভাবচেন কিছু নিশ্চয়ই, তবু বলবেন না।

—ভাবনা মানুষ মাত্রেরই আছে। ব'লে কি হবে?

ললিতা রূঢ় স্বরে বল্‌লে, তা বল্‌বেন কেন?—শুন্‌বেন কেবল অপরের কথা।

সহদেব ইচ্ছে ক'রেই এড়িয়ে গেল ললিতার ভর্ৎসনার দৃষ্টিটা।

সে চোখ নামিয়ে রইলো—তার মনে হলো ললিতার নিষ্পলক চোখদুটি তার জীবনের গভীরতম ব্যর্থতাকে লক্ষ্য ক'রে ব্যঙ্গের হাসি হাস্‌চে।

সহদেবের মনটা কুণ্ঠার গ্লানিতে এবং ললিতার প্রতি বিরূপতায় ভ'রে গেল।

ললিতা অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইলো। একবার বাইরে হ'তে খানিকটা ঘুরে এলো। আবার এসে সহদেবের কাছে একখানা চৌকি টেনে নিয়ে বস্‌লো।

সহদেব একখানা মাসিকের খোলা পাতার ওপর চোখ বুলিয়ে যাচ্ছিল। সে চোখ তুলে চাইলে না।

ললিতার চোখের পাতা ভিজে এলো। সহদেব লক্ষ্যও করলে না।

দুজনে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে থেকে হঠাৎ এক সময় ললিতা সহদেবের হাত হ'তে বইখানা কেড়ে নিয়ে প্রশ্ন করলে, বেশ মানুষ আপনি সরকার মশায়! কথায় কথায় আপনার এমন অভিমান আসে কোথা হ'তে বলতে পারেন? আপনি বেশ চুপ করে থাক্‌তে পারেন, কিন্তু আমি তো পারি না।

সহদেব গম্ভীর ভাবে বল্‌লে, চেষ্টা করলেই পার্‌বে।

—চেষ্টা করলে তো পারবো নিশ্চয়ই, কিন্তু চেষ্টা করতে পারি কই? চেষ্টা কর্‌তে পারি না কেন জানেন? আপনার মনের গড়নটা ভারী নরম, ঠিক্ ছেলেমানুষের মতো, আর তাইতে সেইটি নিয়ে নাড়াচাড়া কর্‌তে আমি ভারী আনন্দ পাই।

সহদেবের মুখের ফাঁকে ফুটে উঠলো ফিকে হাসির রেশ। সে-হাসি চাপতে চেষ্টা ক'রে সহদেব বললে, কথা ব'লে চমক লাগিয়ে দিতে তুমি ওস্তাদ।

ললিতা আঁচলের খুঁটটা পিঠের ওপর ফেলে দিয়ে বল্‌লে, তা যদি পারতুম তা হ'লে তো বাঁচতাম—পারি না ব'লেই তো এতো জ্বালা।

সহদেব চোখ তুলে ললিতার মুখের পানে চাইলে, ললিতার মুখখানা ব্যথায় ঘোরালো হ'য়ে উঠেচে।

ললিতা বল্‌লে, আপনার কৌতূহল ঝর্‌নার মতোই উজ্জ্বল! পাথরের আড়াল দিলেও তাকে ধরে রাখা যায় না।

সহদেবের কাছ হ'তে কোন জবাব এলো না দেখে, ললিতা ক্ষুণ্ণ হলো। সে নিঃশব্দে ব'সে রইলো আনত মুখে। উত্তেজনায় আরক্ত মুখ সাদা হ'য়ে গেল। বিরোধী মন তার বিধ্বস্তের মতো নিমিষে কুঁক্‌ড়ে মাথা নীচু করলে।

এমন ভাবে ব'সে থাক্‌তে সহদেব পারে, কিন্তু ললিতা ধৈর্য্য হারালো। সে সহসা উঠে দাঁড়ালো এক সময় এবং সহদেবের মুখের পানে না চেয়েই ঘর হ'তে বেরিয়ে গেল। যাবার ভঙ্গীমায়

ঝড়ের গতি! যেতে যেতে বল্‌লে, নাঃ। এ পাথর সরিয়ে ফেলতে হবে, ভেঙ্গে চুরমার ক'রে দিতে হবে।

কথার ঝাঁজে সহদেবের সর্ব্বাঙ্গে আগুন ছড়িয়ে গেল। কিন্তু কী যে ললিতা ব'লে গেল সে তার মানে বুঝলে না। বিস্ময়ের আতিশয্যে তার সর্ব্বাঙ্গ কাঁটা দিয়ে উঠ্‌লো। নিদারুণ লজ্জায় সে মাথা তুল্‌তে পারলে না।

ললিতার সাথে অন্তরঙ্গতা যে অতর্কিতে এমনি রূপ বদলাবে এ সহদেব ধারণা করতে পারে নি। নিজেকে সে হারিয়ে ফেল্‌বে এমনি অতর্কিতে এও সে ধারণা করতে পারে নি। চিরদিনের সংযম ও তার বয়স তাঁকে সংযত করেচে—নারী সম্বন্ধে উদাসীন সে চিরকাল। সারা জীবনের পৃষ্ঠাগুলি ওতপ্রোত ভাবে পরীক্ষা করলে এমন দৃষ্টান্ত কোথাও মিলবে না যে নারীর রূপের জলুষ বা একটু করুণার কটাক্ষ সহদেবকে চঞ্চল করে তুলেছে!...আজ এই অবেলায় সে একী কাণ্ড ক'রে বসলো। এ যে তার বয়সের পক্ষে অশোভন, লজ্জাকর। ললিতা তো স্পষ্টই তার মুখের ওপর বল্‌লে, তার কৌতূহল উচ্ছৃঙ্খল। ললিতার বয়সের মেয়ের মনের কথা জান্‌বার এ অদম্য কৌতূহল তার বয়সের পুরুষের পক্ষে মোটেই সুষ্ঠু ও সুশোভন নয়। কী অধিকারে সে ললিতার কাছে অমন গর্হিত এবং অসঙ্গত দাবী করতে গেল। দুদিনের পরিচয়, একটু

স্নেহ ও করুণা ঢেলে দিয়ে তার তৃষাশুষ্ক জীবনকে সে সরস ক'রে তুলতে চেয়েছিল, আর সে এমনি ভাবে তাকে অপমান করলে যে সে অপমানের জ্বালায় সে দীশাহীন হ'য়ে গেল। ললিতা শক্ত মেয়ে, চোখের জল সে চেপে রাখতে জানে তাই, নইলে হয়তো অনর্থ বাধিয়ে দিত।

সহদেবের বুকখানা কেঁপে ওঠে। আত্মগ্লানিতে ও ধিক্কারে মুখখানা মরার মতো পাংশু হ'য়ে ওঠে।

কাজে মন বসলো না।

রাত্রি গভীর হ'য়ে এলো, অন্ধকারের নিঃশব্দ শূন্যতায় সহদেব হাঁপিয়ে উঠলো। নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে শয্যার প্রান্তে সে নিজেকে মিশিয়ে নিল।

অনিদ্রায় চোখদুটো কাঠ হ'য়ে এলো। অপমানে, বিক্ষোভে অন্তরাত্মা ককিয়ে উঠলো। সারারাত্রি সে অনুশোচনার আগুনে পুড়ে নির্জ্জীবের মতো বিছানায় পড়ে রইলো। এর পর আর সে এখানে থাকতে পারবে না, একটি দিনও নয়। ললিতাকে হারিয়ে তার ঘৃণা কুড়িয়ে সে এখানে থাকতে পারবে না। হয়তো ললিতাও এরপর এখান হ'তে চলে যাবে। তার আত্ম-সম্মানে সে আঘাত দিয়েছে!

গত সন্ধ্যায় ললিতা আসে নি, আজো এবং আর কখনো যে সে আসবে না, সে সম্বন্ধে সহদেবের এতটুকু সন্দেহ ছিল না।

ভোরের দিকে সহদেব ঘুমিয়ে পড়েছিল, এবং অনেকখানি বেলা পর্য্যন্ত সে বিছানা হতে উঠলো না। যখন তার ঘুম

ভাঙলো তখন কিন্তু তার বিস্ময়ের অবধি রইলো না। ঘুম বিজড়িত চোখে বারবার সে ঘরের মাঝে চাইতে লাগ্‌লো। তৃপ্তির পুলকে তার মুখখানি উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌লো। শিয়রে কখন ললিতা এসে ব'সেচে।

ললিতা জিগ্‌গেস করলে,—এখনো শুয়ে আছেন যে! শরীর ভাল আছে তো?

ললিতার স্বর স্নিগ্ধ, স্নেহসজল!

সহদেব কথা বল্‌তে পার্‌লে না, শুধু ঘাড় নেড়ে জানালে, শরীর ভালোই আছে।

ললিতা লক্ষ্য করলে সহদেবের চোখদুটী ভারী ও বাষ্পাচ্ছন্ন হ'য়ে আস্‌ছে। প্রভাতের এই দীপ্তি পাছে আবার কুয়াসায় ঢেকে ফেলে, তাই সে সহদেবকে কোন কিছু বল্‌বার অবকাশ না দিয়ে বল্‌লে, শীগ্‌গির ক'রে উঠে মুখহাত ধুয়ে তৈরী হ'য়ে নিন্। আমি তৈরী হ'য়ে এসেচি, আজ খুব লম্বা পাড়ি দিতে হবে, হয়তো এবেলা ফেরা না হ'তেও পারে। নিন্, উঠুন শীগগিরী, দেরী করলে চল্‌বে না, রোদে ভারী কষ্ট হবে।

সহদেব উঠে বস্‌লো। ললিতা বল্‌লে, যান্, আপনি শীগগিরি সেরে নিন্। আমি চায়ের জল গরম করি।

ললিতা ঘর হ'তে বেরিয়ে গেল। সহদেবকে কে যেন হাত ধ'রে টেনে তুলে দিল।

নয়

—স্থির হ'য়ে বস্থন, এই পাথরের ওপর। তারপর মনযোগ দিয়ে শুনুন্, আমার জীবনের কাহিনী। যা না শুনে আপনার কাল ঘুমের ব্যাঘাত ঘটেছে।

পাহাড়ের কোলে গড়িয়েপড়া একখানা অতিকায় কালো পাথরের ওপর পা ছড়িয়ে ব'সে আঁচলে মুড়ি নিয়ে ললিতা তাই চিবুচ্ছিল। পাথরের আশে পাশে পেছনে সাম্‌নে চারা শালগাছ। গাছের ফাঁকে ফাঁকে সোনালী রোদ এসে ছড়িয়ে পড়েছে, ললিতার পায়ের ওপর এবং শাড়ীর আঁচলে। তারই দু'একটা ছিটে এসে লেগেচে তার নিবিড় কালো চুলে এবং কপোলে। সহদেব পাশে দাঁড়িয়ে নির্নিমেষে দেখছিল, বনস্থলী আলো-করা বনদেবীর মতো সেই অপরূপ রূপ।

ললিতা তার মুখের পানে চেয়ে বল্‌লে, অমন ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বস্থন না, এই পাথরখানার ওপর। জায়গাটা বেশ নিরিবিলি না?

সহদেব বল্‌লে, চমৎকার! কিন্তু এত নিরিবিলিও ভাল

নয়। ওপরের পাহাড়ের ঐ জঙ্গল হ'তে চাইকি নিরিবিলি আলাপ কর্‌বার জন্যে পাকা ছ'হাত লম্বা, গায়ে গুল্‌বসানো জানোয়ার বিশেষ হালুম্‌ ক'রে আমাদের পায়ের তলায় এসে ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ ক'রে আমাদের মুখের পানে চেয়ে লেজ নাড়তে পারে।

ললিতা চোরা চাউনীতে সহদেবের পানে চেয়ে মুখ টিপে হাস্‌লে।

সহদেব একটা গাছের ডাল ধরে পাথরের ওপর উঠে বসে চাপা গলায় বল্‌লে, ওই ওপর থেকে কেমন একটা বোঁটকা গন্ধ ভেসে আস্‌চে না?

ললিতা মুহূর্ত্ত কেঁপে উঠেই আবার নিঃশব্দে সহদেবের মুখের পানে চাইলে।

সহদেব হাস্‌লে। ললিতা বল্‌লে, আমার ভয় দেখিয়ে কোন লাভ নেই। আর বাঘের চাইতে মানুষকে আমি ভয় করি বেশী।

সহদেব বল্‌লে, এতই যদি ভয় একা আমার সঙ্গে এলে কেন?

ললিতা ভ্রূকুটি ক'রে বল্‌লে, মানুষ বল্‌তেই তো আর আপনাকেই বোঝায় না। কথা বোঝবার শক্তি নেই এক কড়াও, অথচ সব কথায় খুঁৎ ধরা চাই।

সহদেব বিস্ময়ে ললিতার মুখের পানে চাইলে। এতবড় কথা আর কেউ সহদেবের মুখের ওপর বল্‌তে সাহস করে নি।

তাই প্রথমটা সহদেব থাতিয়ে গেল, কিন্তু অন্তরে সে একটা অভিনব পুলক অনুভব করলে। যতই রুক্ষ হোক্ কথাটার মাঝে সস্নেহ অনুযোগ র'য়েচে।

সহদেব বল্‌লে, অপরাধ হ'য়েচে—মাপ চাইচি।

ললিতা রুক্ষস্বরে বল্‌লে, মাপ অতো সস্তা নয়! ওঁকে আবার আমায় ভয় করতে হবে! আশ্চর্য্য! দাদামশায়ের বয়সের লোক, তার সঙ্গে চলাফেরা করতে ভয়! মানুষের দেহের শক্তিকে আমি ভয় করি না, আমি ভয় করি মানুষের অন্তরকে। শুধু ভয় করি না, ঘৃণা করি।

সহদেব হাসিমুখে গ্রহণ করলো, ললিতার এ আঘাত।

ললিতা বোধ হয় নিজের আচরণে লজ্জিত হ'য়েই হাসলে।

ললিতা বললে, দেখুন সরকার মশায় কাল হ'তে আমাদের 'কলহ-চন্দ্র' যাচ্চে, তাই কথায় কথায় আমাদের ঝগড়া বাধচে। না, আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আর ঝগ্‌ড়া করবো না। আপনাকেও সাবধান ক'রে দিচ্চি, যা তা ব'লে আমার মাথা গরম ক'রে দেবেন না।

সহদেব একটা হাভানা সিগারের মুখটা ছুরী দিয়ে কাট্‌তে কাট্‌তে জিগগেস করলে, আচ্ছা ললিতারাণী, যদি কিছু মনে না করো তো একটা কথা জিগগেস করি—

ললিতা বল্‌লে, ভূমিকা ছেড়ে বলুনই না—

সহদেব সিগারটা দাঁতে টিপে ধরে বল্‌লে, এই হঠাৎ মাথা গরম হওয়াটা কি তোমার নিজস্ব না এটা তোমাদের স্ত্রীজাতির বিশেষত্ব।

ললিতা চোরা কটাক্ষ হেনে সহদেবকে শাসাতে গিয়ে হেসে ফেল্‌লে।

সহদেব সিগারটা ধরিয়ে গম্ভীর ভাবে বল্‌লে, তুমি হাস্‌তে পারো, কিন্তু আমার যখন জানা নেই, তখন জিগগেস কর্‌তে আমার লজ্জা নেই। স্ত্রীচরিত্র সম্বন্ধে আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই কারণ আমি ঘনিষ্ঠভাবে কোনদিন কোন নারীর সাথে মিশি নি। আমি সেই অভিজ্ঞতাটুকু অর্জ্জন করতে চাই তোমার কাছ হ'তে। যে জানে তার কাছে আমার শিখতে কোন লজ্জা নেই, হোক্ না সে আমার চেয়ে বয়সে ছোট—

ললিতা বল্‌লে: আমি ত আর মাষ্টারী করতে আসিনি এখানে। উঃ! আমার ভারী তেষ্টা পেয়েচে।

ললিতা উঠে দাঁড়ালো।

সহদেব বল্‌লে, চলো, ওপরে একটা ঝর্‌না আছে সেইখানে জল খাবে।

হুজনে ওপরে উঠে গেল। ওঠার পথে একটা টিনের চালা। যাত্রীদের বিশ্রামস্থান। সেখানে একদল নরনারী 'পিক্‌নিক্' করচে।

ছুটি তরুণী আহারের ব্যবস্থা করচে। সহদেব একটা দীর্ঘ-শ্বাস ফেলে বল্‌লে, নারী ভিন্ন আহারের ব্যবস্থাটা অমন সুচারু ভাবে করতে আর কেউ পারে না।

ললিতা উঠতে উঠতে নীচুগলায় উত্তর দিলে, যদি না তারা বি, এ পাশ করা হয়।

সহদেব বল্‌লে, মেয়েদুটিকে দেখে তাই মনে হলো। গ্রাজুয়েট তো নয়ই।

ললিতা জিগ্‌গেস করলে, কী ক'রে বুঝলেন ?

সহদেব বল্‌লে : দেখলেই বোঝা যায়। না হোক্ গ্রাজুয়েট, কিন্তু বেশ লক্ষ্মীর মতো স্ত্রী আর বেশ গোছালো।

ললিতা বল্‌লে, বি-এ পাশ করলেই বুঝি অগোছাল হয়, নয় ?

সহদেব নিঃশব্দে সিগারেটে ঘন ঘন টান দিল।

ললিতা জোরে জোরে পা চালিয়ে বল্‌লে, নির্ভাবনায় একজন পুরুষের কাঁধে চেপে জীবনটা কাটাতে পেলে অমন সবাই গোছালো হ'তে পারে।

সহদেব হাস্‌লে। বল্‌লে, ইচ্ছে করলে তুমিও পারতে !

ললিতা অগ্নিময় দৃষ্টি দিয়ে পিছন পানে চেয়ে জিগ্‌গেস কর্‌লে, কী বল্‌লেন ?

সহদেব তার দৃষ্টির নীচে সঙ্কুচিত হ'য়ে গেল।

তার মুখের চেহারা দেখে ললিতা হেসে ফেল্‌লে।

সহদেব সাহস সঞ্চয় ক'রে উত্তর দিল, বলছিলুম ইচ্ছে করলে তুমিও তো পারতে। তোমার যা রূপ আর বুদ্ধি তাতে তোমার মতো স্ত্রীকে—

ললিতা বাধা দিয়ে বল্‌লে, মাথায় ক'রে রাখতো, এই না ? কিন্তু দুঃখের বিষয় আপনি ছাড়া আর কেউ আমার কদর বুঝলে না। দয়া ক'রে আপনি ঘটকালী করুন না। একটা উপকার করা হবে—

ফিকে হাসিতে সহদেবের মুখখানা ভরে গেল, কিন্তু ভেতরে সে হাঁপিয়ে উঠলো।

ঝরনার ধারে একটা গাছের নীচে বসে ললিতা বল্‌লে, সরকার মশায়, ইচ্ছে কর্‌লেই সব জিনিষ ঘটে না। বিশেষ বাঙলার হিন্দু সমাজে অভিভাবকহীন অজ্ঞাতকুলশীলা মেয়ের বিয়ে হয়না। সমাজের অতখানি সাহস এবং উদারতা এখনো হয়নি।

সহদেব বিস্ময়ে তার মুখের পানে চাইলে, ললিতার সকরুণ গলার সুর আর্ত্তনাদের মত তার বুকের মাঝে আছড়ে পড়ল। ললিতা বললে, দারিদ্র্যের কাঠ্‌ফাটা রোদে পুড়ে পুড়ে জীবনের সকাল বেলাটি কেটেছে। একমাত্র অভিভাবক পিতা—কাজ করতেন জামালপুরের রেলওয়ে ওয়ার্কসপে। মার মৃত্যুর পর তিনি এক খৃষ্টান আয়াকে করলেন বিয়ে, এবং আমায় এক মিশনারী বোর্ডিংএ দিলেন ভর্ত্তি ক'রে। সেখানে আমি লেখাপড়া শিখ্‌ছিলুম কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই বাবার মৃত্যু হলো, এবং আমাকে এক মিশনরী orphanageএ পাঠিয়ে দিল সেখানকার কর্ত্তৃপক্ষরা। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ ক'রে কত চাক্‌রীর চেষ্টাই না করেছি, কোথাও জোটেনি। শেষে অনাহারে, অর্দ্ধাহারে কতদিন কেটেছে! বাবার পরিচিত এক ফিরিঙ্গী Foremanএর বাড়ীতে শিক্ষয়িত্রীর কাজ জুটিয়ে প্রাইভেট ইণ্টারমিডিয়েট একজামিন দেবার জন্য তৈরি হ'তে লাগলুম। আমার দুঃখ দারিদ্র্য সহজেই ঘুচ্‌তো যদি আমি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ

করতুম। খৃষ্টানও হলুম না অথচ হিন্দু সমাজও আমায় আশ্রয় দিল না। একটা টুইশনি জুটিয়ে কল্‌কাতার কলেজে ভর্ত্তি হলুম বি-এ, পড়বার জন্য। সেখানে আমার ভক্ত জুট্‌লো অনেক, ছাত্র থেকে প্রফেসার পর্য্যন্ত। কিন্তু দুঃখের কথা বল্‌বো কি সরকার মশায়, সকলেই চাইলে আমার দেহটাকে, বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে কেউই এলো না। সে সম্মান দিতে কেউ রাজী হলো না। তারা চাইলে আমার দারিদ্র্য ঘোচাতে, আমার যৌবনের বিনিময়ে। এই তো আপনাদের সমাজ! সেই সময় মাঝে মাঝে মনে হতো কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে দেখ্‌তে—একজনও এমন কেউ আছে কি না যে আমায় জীবন-সঙ্গিনী ক'রে নিতে চায়।

ললিতার দুচোখ জলে ভরে এলো তবু সে হাসতে চেষ্টা কর্‌ল।

সহদেবের বুকের নীচেটা ব্যথায় ফেনিয়ে উঠ্‌লো, কম্পিত কণ্ঠে বল্‌লে, ললিতা, চলো নেমে যাই।

ললিতা আঁচলে চোখ মুছে উঠে দাঁড়ালো।

নামবার পথে ললিতা একসময় সহদেবকে জিগ্‌গেস করলে, আচ্ছা সরকার মশায়, দরিদ্র হওয়া কি পাপ?

সহদেব কী যে জবাব দেবে বুঝ্‌তে পারলে না। ললিতার প্রশ্নটা কিন্তু সহদেবের বুকের মাঝে বিঁধ্‌লো ধারালো তীরের মতো।

দারিদ্র্য কি পাপ? ভাব্‌বার কথা বটে! জীবনের প্রভাতে

দারিদ্র্য যে তার কত বড় দুঃখময় চেতনা তা উপলব্ধি করে সহদেব শিউরে উঠ্‌লো; শিরা উপশিরা গুলো মর্ম্মান্ত বেদনায় টন্‌টন করতে লাগ্‌লো। দারিদ্র্য! দারিদ্র্যই তার জীবনকে শ্মশান ক'রে দিয়েছে। দারিদ্র্য ঘোচাতে গিয়ে মনের সমস্ত সম্পদ সে হারিয়ে ফেলেছে। দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে গিয়ে কী সে পেলে আর কী সে হারালে! যা সে হারিয়েছে এ জীবনে আর সে ফিরে পাবে না।

ললিতার বিশুষ্ক ম্লান মুখের পানে চেয়ে সহদেবের মনে হলো, দারিদ্র্যের অন্ধকারে এই মেয়েটির জীবনও ব্যর্থ হ'তে ব'সেছে। জীবনের বসন্ত নিঃশ্বাস ফেলে সরে যাচ্ছে, ফোট্‌বার অবকাশ পেলে না।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে সহদেব বল্‌লে, দারিদ্র্য পাপ কি না বল্‌তে পারি না ললিতা, কিন্তু একটা মস্ত অভিশাপ। দারিদ্র্যের যে কী জ্বালা ললিতা তোমার চেয়ে আমি কম বুঝি না, কিন্তু অনুশোচনা ক'রে লাভ কি? মনের দারিদ্র্যকে আমি পাপ বল্‌তে কুণ্ঠিত নই। মনের সম্পদই মানুষের আসল সম্পদ।

ললিতা নিঃশব্দে নাম্‌তে লাগল।

সহদেব বল্‌লে, দারিদ্র্য মূর্ত্তি-ধরে আমায় গ্রাস করতে এসেছে, আমি ভয় পাইনি, হাসিমুখে তাকে পরিহাস করেচি। একদিকে যেমন সে আমার কাছে পরাভূত হয়েচে, অন্যদিকে সে আমায় তেম্‌নি সর্ব্বহারা করেচে।

ললিতা চোখদুটি প্রসারিত করে সহদেবের ব্যথিত মুখের পানে চাইলে।

সহদেব বল্লে, জীবনের সমস্ত সুখদুঃখ ঐশ্বর্য্যের ওপর নির্ভর করে না ললিতা, যেটাকে আমরা চরম দুর্ভাগ্য মনে করি সেটা কিন্তু ঠিক্ তা নয়। খুঁজে নিতে পার্লে দারিদ্র্যের মাঝেও যথেষ্ট সুখ মেলে।

ললিতা ম্লান হাসিতে মুখখানি ভরে বল্লে, ওসব ওমর খৈয়ামের দর্শনবাদ। আমাদের বিশ্বকবিও ঐ কথাই বলেছেন।

ললিতা সুর ক'রে আবৃত্তি করলে ঃ

"—রিক্ত যারা সর্ব্বহারা
সর্ব্বজয়ী বিশ্বে তা'রা
গর্ব্বময়ী ভাগ্যদেবীর
নয়কো তারা ক্রীতদাস।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে
করবো মোরা পরিহাস॥"

সহদেব বললে, মানুষের কথাই ওই। চিরন্তন শাশ্বত বাণী।

দশ

ললিতা সেদিন সহদেবকে জানালে তার ছুটির আর সপ্তাহ-মাত্র বাকি। সপ্তাহ পরেই তাকে ফির্‌তে হবে।

সহদেব এর জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না এবং এ কথাটা সে ভুলেই গিয়েছিল যে ললিতাকে ছুটি ফুরোলেই ফিরতে হবে। ললিতার সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতা এম্‌নি ঘন হ'য়ে উঠেছিল যে, একথা ভাব্‌বার মতো তার মনে এতটুকু ফাঁক ছিল না যে, ললিতা এখানে চিরদিনের জন্য আসেনি এবং আবার দুদিন বাদে সে এখান হ'তে চলে যাবে। তাই সংবাদটা সহদেবকে আঘাত করলে, একটা আকস্মিক দুর্ঘটনার মতো। কিছুক্ষণ আনত মুখে বিমূঢ়ের মতো ব'সে থেকে ধীরে ধীরে সে সেখান থেকে উঠে গেল, ধাক্কার প্রথম বেগটা সাম্‌লাবার জন্যে।

সহদেব উঠে যেতেই ললিতার মুখে ফুটে উঠ্‌লো হাসির হিল্লোল, অশ্রুর আভাসে চোখদুটো কিন্তু চক্‌ চক্‌ ক'রে উঠ্‌লো ; রৌদ্রদীপ্ত আকাশ হ'তে বৃষ্টি নাম্‌লো। ললিতা মুখ তুলে এক-দৃষ্টে চেয়ে রইলো অবসন্ন দিনের পাণ্ডুর আলোর দিকে।

চোখের জলে সাম্‌নের সব কিছুই অস্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌লো। উল্লাসে কিন্তু থেকে থেকে তার সর্ব্বাঙ্গ কেঁপে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। তার বিরহ যে কাউকে এমন ভাবে ব্যথিত ক'রে তুল্‌তে পারে এ সংবাদে কার মনে না উল্লাস হয়? ললিতার নারীজীবনে এ একটা নূতনতর চেতনা। ললিতাকে বেশ একটু ভাবিয়ে তুল্‌লে। ঘুমন্তকে আচম্‌কা জাগিয়ে তুল্‌লে যেমন হয় মুখের ভাবটা ঠিক্ তেম্‌নি ক'রে ললিতা নিঃশব্দ বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে রইলো। এর সবটাই যেন তার কাছে অপরিচয়ের রহস্য দিয়ে ঘেরা। অথচ দাম হিসাবে জিনিষটা সস্তা নয়। এর নীচে ব্যথা যতোই থাক্ আনন্দও বড়ো কম নয়।

বয়সের কথা সহদেবের সব সময় মনে থাকে না, কাজেই তাকে অনেক সময় ললিতার কাছে আঘাত পেতে হয়। সহসা সে এম্‌নি চঞ্চল ও এলোমেলো হ'য়ে পড়ে যে ললিতার হাসি চেপে রাখা দায় হ'য়ে ওঠে। আবার দুঃখও হয় তার এই স্বভাবের জন্যে। ভাব্‌তে ভাব্‌তে দুঃখটুকু পর্য্যবসিত হয় মায়ায়। লোকটির এই ছেলেমানুষীটুকু ললিতার মনকে স্পর্শ করে। তার বয়সের তরুণীর পক্ষে সহদেবকে মেনে নেবার মতো কোন আকর্ষণই নেই, তবু তার সদা অসতর্ক মনের চাঞ্চল্যটুকু ললিতার বুকের মাঝে হাতুড়ী পিট্‌তে থাকে।

সহদেব যে মূর্ত্তি নিয়ে সহসা ঘর হ'তে বেরিয়ে গেল, তা একেবারে নতুন এবং ললিতার কল্পনাতীত! সহদেব যেদিকে গেল সেইদিকে কান পেতে ললিতা লাইব্রেরী ঘরে গিয়ে বস্‌লো।

অনেকক্ষণ কেটে গেল। সহদেব কিন্তু ফিরলো না।

ললিতা একখানা বই খুলে পড়্‌বার চেষ্টা করলে, কিন্তু সহদেবের এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন কিছুতেই তার মস্তিষ্কের সীমা ছাড়্‌তে চাইলে না। ছুচারজন লোকও এলো গেল, ললিতা কিন্তু নির্বাত আকাশের মতই নিশ্চল হ'য়ে ব'সে রইলো। তার বিরহের বেদনা একজন পুরুষের বুকে নিবিড় হ'য়ে উঠেচে এই কথাটাই তার যৌবনের মনে উত্তাল হ'য়ে উঠ্‌লো। যৌবনের আবেগ যদিও তার দেহতটের অনেক নীচে শীতের শীর্ণকায়া নদীর মতো ক্ষীণস্রোতে ব'য়ে যাচ্ছিল, তবুও সহদেবের এই আকস্মিক ভাবান্তর তার যৌবনকে উদ্দাম ক'রে তুল্‌লে।

ললিতা ব'সে থাকতে পারল না। কে যেন চাবুক মেরে তাকে উঠিয়ে দিল। সে নিঃশব্দে পা টিপে টিপে সহদেবের ঘরের চৌকাঠে এসে দাঁড়াল।

আধ্‌-আঁধার ঘরের কোণে একটা প্যাকিং কেশের ওপর পা ঝুলিয়ে মাথা নীচু করে সহদেব ব'সে আছে, নিরাশ্রয়ের মতো। উদাস মুখের রেখায় অখণ্ড রিক্ততা! জীবনের সব উৎসাহ গেছে নিভে। কে যেন তার জীবনের অহঙ্কারে প্রচণ্ড আঘাত ক'রেছে।

ললিতা যে চৌকাঠে এসে দাঁড়িয়েছে সহদেব জান্‌তেও পার্‌লে না, সে তেম্‌নি নিঃশব্দে ব'সে রইলো। ললিতাও দাঁড়িয়ে রইলো রুদ্ধ নিঃশ্বাসে। অন্ধকারে তার চোখদুটো চক্‌ চক্‌ করতে লাগলো।

ললিতা ধীরে ধীরে একসময় তার সাম্‌নে এসে দাঁড়াল। সহদেব দেখলে তাকে, কিন্তু মুখ তুলে তাকালে না।

সহদেব কি বল্‌তে চাইলে কিন্তু ললিতার চোখের জ্বলন্ত দৃষ্টি তাকে অতর্কিতে যেন একটা আবর্ত্তের মধ্যে ফেলে দিল, পাক খেয়ে খেয়ে সে হাঁপিয়ে উঠলো।

ললিতা জিগগেস করলে, কী ভাবচেন একলা ব'সে?

সহদেব অসহিষ্ণু কণ্ঠে উত্তর দিল, ভাবচি তুমি চলে গেলে তোমার বিরহে আত্মঘাতী হব কি না?

ললিতার মুখে ফুটে উঠলো ব্যঙ্গের হাসি। বল্‌লে, আমি কে যে আপনি আমার জন্যে আত্মঘাতী হবেন?

—আমি তো জানি তুমি আমার কেউ নও, কিন্তু তোমার ধারণা তুমি আমার সব এবং তুমি না হ'লে আমার এক দণ্ডও চল্‌বে না।

সহদেবের গলার স্বর রুক্ষ, নালিশ ভরা।

ললিতা শুধু মনে মনে মলে হাস্‌লে। রাগ যে তার না হলো এমন নয় কিন্তু সহদেবকে আয়ত্ত করবার একটি মাত্র রাস্তা সে জানে, তা হ'ল শাসন। সহজেই সে শাসনের অধীন, অন্ততঃ ললিতার শাসন সে মানে, হয়তো তার শাসন সে পছন্দও করে। সাধারণ মেয়ের মতো রাগ বা অভিমান করে থাক্‌লে তাকেই পরাস্ত হ'তে হ'বে। ললিতা সে জাতের মেয়ে নয়। সে কিছুতেই হার মান্‌তে চায় না। বিশেষ যাকে সে ভক্তি করে, শ্রদ্ধার চোখে দেখে তাকে কিছুতেই সে অশ্রদ্ধার নিম্নস্তরে নাম্‌তে

দিতে চায় না। সে-অসম্মান থেকে বাঁচাবার জন্যে তাকে যত কঠিনই হতে হয় সে হবে, প্রশ্রয় দিতে সে পারবে না। তাই সে সহদেবের এই অবজ্ঞাকে গায়ে মাখলে না, তার কথার ঝাঁজে সে চম্‌কে উঠেছিল এবং মুহূর্ত্তের জন্য স্তম্ভিতও হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু মুখে সে ভাবটুকু ফুটে ওঠ্‌বার আগেই সে নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে শুধু মনে মনে হাস্‌লে, তারপর শান্ত, সংযত গলায় বল্‌লে, কথাটা কি মিছে? আমি জানি এবং তোমার অন্তরাত্মা জানে আমি তোমার কে এবং আমাকে না হ'লে তোমার চল্‌তে পারে কিনা। আমার বিরহের কল্পনাতেই যার এই অবস্থা—

বাকিটুকু আর ললিতা বল্‌তে পারলে না, মুখে আঁচল দিয়ে হেসে উঠলো।

সহদেব অবাক্ হ'য়ে গেল। এম্‌নি প্রসন্নমুখে এম্‌নি হাসি, এ তো সহদেব আশা করে নি। সে আঘাত করতে চেয়েছিল কিন্তু যাকে আঘাত কর্‌বে সে বাধা দিলে না, হাসিমুখে বুক পেতে আঘাত সহ্য করলে, ব্যথা এতটুকু পেলে না। এ যে কত বড় শক্তি তাই ভেবে সহদেব অবাক্ হ'য়ে গেল। বরং উল্টো ধাক্কাটা নিজেকেই আঘাত কর্‌লে।

ললিতা বল্‌লে, তোমার মন যে কত কাঁচা, দুদিনের আলাপেই তা বুঝতে পেরেচি! কিন্তু এই দুঃখ পাওয়াটা নিজের সৃষ্টি। দুঃখ কষ্ট মানুষকে পেতেই হয়, কিন্তু তাই বলে বিদ্রোহ করা চলে না। এই সব ছেলেমানুষী দেখ্‌লে আমার এম্‌নি হাসি পায়!

বাহাত্তর

সহদেবের মুখখানা লজ্জায় আরক্ত হ'য়ে উঠ্‌লো।

ললিতা গলায় বেশ জোর দিয়েই বল্‌লে, চিরদিন আপনাতে আপনি খাড়া ছিলে, কিন্তু আমাকে দেখ্‌বার পর থেকেই তুমি নিজেকে আল্গা দিলে, এবং আমাকে আশ্রয় ক'রে জীবনটা কাটাতে চাইলে, কাজেই এখন আর আমাকে বাদ দিয়ে তোমার চল্‌তে পারে না।

সহদেব বুঝলে ললিতা তার সবটুকু দুর্ব্বলতা ধ'রে ফেলেচে, তবুও যে স্বল্প আবরণটুকু দিয়ে ঢেকে রেখেছিল, আজ ইচ্ছে ক'রেই স্পর্দ্ধার সঙ্গে সেই আবরণটুকু সে সরিয়ে দিল।

ললিতা বল্‌লে, ঘরে আলো জ্বেলে দিই—

সহদেব করুণমুখে সঙ্কোচের সুরে বল্‌লে, থাক্‌, দরকার নেই।

ললিতা যেতে যেতে আবার পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, এতই যদি লজ্জা, তবে এ ছেলেমানুষীর দরকার কি ছিল? আলোতে চোখ মেলে চাইতেই যত লজ্জা না? লজ্জা আমার নেই? মনের মধ্যে সমস্ত গুছিয়ে নিয়ে তবে আজ এখানে এসেছিলুম তোমাকে যাওয়ার কথা বল্‌তে, কিন্তু এম্‌নি কাণ্ডটি ক'রে বস্‌লে যে আমাকে নির্লজ্জের মত স্পষ্ট ক'রে দিলে।

ললিতা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সহদেব কাঠের মূর্ত্তির মতো শক্ত হ'য়ে ব'সে রইলো।

আলো নিয়ে ললিতা ঘরে ঢুক্‌লো। সহদেব নতনেত্রে স্থির হ'য়ে রইলো।

ললিতা আলোটা টেবিলের ওপর রেখে সহদেবের কাছে বাক্সর ওপর এসে বসল'। ললিতার সান্নিধ্য সহদেবকে চঞ্চল ক'রে তুল্‌লো। তার প্রতি আকর্ষণ দুর্নিবার বেগে প্রবল হ'য়ে উঠ্‌লো।

ললিতা আর একটু কাছে সরে এসে নীচুগলায় জিগ্‌গেস করলে, আজ সত্যি বলো—লুকিয়ো না।

সহদেব জিজ্ঞাসু চোখে ললিতার মুখের পানে চাইলে। সেই নির্জ্জন ঘরের স্বল্প আলোয় ললিতার মুখের পানে চেয়ে তার বিস্ময়ের অবধি রইল না। সহদেব ওকে যেন আজ নতুন ক'রে দেখলে। কী অপরূপ আবির্ভাব! দীর্ঘায়ত চোখদুটিতে প্রশান্ত স্নিগ্ধ দীপ্তি। মুখে চোখে অভিমানের চিহ্নটুকু নেই; মুখের মধ্যে একটি অনির্ব্বচনীয় শান্ততা!

ললিতা বল্‌লে, তুমি বল্‌তে চাও আমাকে তোমার ভালো লাগে?

সহদেব অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে উঠ্‌লো, আমায় মাপ করো, আমি এর উত্তর দিতে অক্ষম। আমি পার্‌বো না—বল্‌তে পার্‌বো না।

সহদেবের উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে ললিতা থম্‌কে গেল।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে আবার ললিতা জিগ্‌গেস্ করলে, এখন কি করতে চাও আমায় বলো। তুমি যা বল্‌বে তাই আমি করবো। তোমাকে দুঃখ দিতে চাই না ব'লেই জিগ্‌গেস

করছি, নইলে এমনভাবে নিজের সম্মানকে কারো কাছে ক্ষুণ্ণ হ'তে দিইনি কোন দিন।

সহদেবের মনের মেঘটা পাৎলা হ'য়ে এসেছিল। মুখের প্রসন্নতা ফিরে এসেছিল। সে প্রসন্নদৃষ্টি দিয়ে ললিতার মুখের পানে চাইলে। তার বুকের মাঝে রক্ত তোলপাড় করতে লাগ্‌ল। সেই মুখটি কেন যে মনকে এমন প্রবল শক্তি দিয়ে টানে তাই সহদেব ভাব্‌তে লাগ্‌লো তার মুখের পানে অপলক দৃষ্টি রেখে।

ললিতা বল্‌লে, কী বলো, অমন চুপ ক'রে থাক্‌লে চল্‌বে না।

ঘরের কোণে একটা কেরোসিনের হারিকেন জ্বল্‌ছিল, সহদেব সেই দিকে মুখ ফিরিয়ে উত্তর দিল, বল্‌বার কিছু নেই, তোমার ইচ্ছায় বাধা দেবার অধিকার তো আমার নেই।

ললিতা কৃত্রিম ক্রোধের স্বরে বল্‌লে, সেই অভিমানের কথা! উঃ! আমার মাথা খুঁড়ে মর্‌তে ইচ্ছে করে।

সহদেবের মনটা খুশীতে ভ'রে উঠলো, সে মনে মনে হাসলে।

ললিতা বল্‌লে, আমি অতো বাধ্যবাধকতার ধার ধারিনে। অধিকার কোথায় কার কতোটুকু আছে তা নিজের অগোচরেই প্রকাশ পেয়ে যায়। মুখে বড়াই করবার প্রয়োজন হয় না।

ললিতার বলবার ভঙ্গীতে একটি অনায়াস ও তেজোময় দৃঢ়তা। তার দৃপ্ত অচপল ও অকুণ্ঠিত আত্মপ্রকাশের সৌন্দর্য্যে সহদেব মুগ্ধ হ'য়ে গেল। ললিতা গরিব, নিজের জীবিকা

নিজেকে অর্জ্জন করতে হয় তাতে তার এতোটুকু দুঃখ নেই, লজ্জা নেই। তার অন্তরের ঐশ্বর্য্যেই সে জীবনে পূর্ণতা লাভ ক'রেছে। বলবার মতো অনেক কথাই তার মনের মাঝে হাঁসফাস করছিল, কিন্তু বলবার ফুরসৎ সে পেলে না—মধ্য পথেই যবনিকাপাত হলো।

ললিতার কাহার চাকরটা এসে সংবাদ দিল, একখানা তার এসেচে, জরুরী ভেবে পিয়নকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি।

ললিতা রুদ্ধনিঃশ্বাসে জিগগেস করলে, আমার তার? তারপর বললে, নিয়ে এসো।

চাকরটা বাইরে গেলে ললিতা সহদেবকে বললে, বুঝতে পারচেন? ডাক এসেছে।

তারটা খুলে পড়ে ললিতা একটা আরামের দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, যা ভাবছিলুম তা নয়, এক বন্ধু তার ক'রেচে, তিনি আসচেন কাল এখানে, ভোরের ট্রেনে এসে পৌঁছবেন, ষ্টেশনে যাবার হুকুম হ'য়েচে।

সহদেবের হাতে টেলিগ্রামটা দিয়ে ললিতা বললে, আমার ছুটি এলো ফুরিয়ে আর এই সময় ভদ্রলোকের আসবার সময় হলো। কী করি বলুন তো?

—দরখাস্ত ক'রে ছুটি বাড়িয়ে নাও।

ললিতা চোরা চাহনীতে সহদেবের মুখের পানে চাইলে।

এগারো

ট্রেণটা ষ্টেশনে এসে পৌঁছায় ভোর ছটায়। শীতের দিনে ছটার সময় বেশ অন্ধকার থাকে। তারো ঘণ্টাখানেক পূর্ব্বে ললিতা শয্যা ছেড়ে উঠে সাজগোছ ক'রে ষ্টেশনের পথে বেরিয়ে পড়লো। নিঝুম, নিস্তব্ধ পথ। শীতের ঘন কুয়াসা অন্ধকারকে পাৎলা হ'তে দিচ্চে না। দূরসন্ধিৎসু দৃষ্টি প্রতিহত হ'য়ে ফিরে আসে। কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া বুকের হাড়গুলোকে পর্য্যন্ত কাঁপিয়ে তোলে। পথের ওপর টর্চ্চের আলো ফেলে দ্রুতপায়ে ললিতা এগিয়ে চল্‌লো। খুব কম হ'লেও মাইল দুই পথ। কুয়াসার বুক চিরে টর্চ্চের তীব্র আলো সেই গভীর আচ্ছন্নতাকে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে দিচ্চে। আঁধার অপসারিত হ'চ্চে তার সাম্‌নে হ'তে, পাশের ও পিছনের আঁধারকে ঘনতর ক'রে তুলে। আপাদমস্তক আলোয়ানে ঢেকে ললিতা চল্‌তে থাকে। সাম্‌নে আরো একদল নরনারীর কলকণ্ঠ শোনা যাচ্চে। তারাও ষ্টেশনে যাচ্ছে, বোধ হয় প্রিয়জন কেউ তাদের আস্‌চে। ললিতার বুকের নীচেটা আগ্রহে কাঁপ্‌ছে। ভোরের বাতাসের মাদকতা

অনাবৃত মুখের ওপর লুটোপুটি খাচ্চে আর তার বুকের স্পন্দন বাড়িয়ে তুল্‌চে। ঐ এঞ্জিনের বাঁশী বাজ্‌লো, তীক্ষ্ণ, কর্কশ স্বর! ললিতার বুকে এসে আচমকা বিঁধ্‌লো কার আকুল আহ্বানের মতো, করুণ সুরে। তবে কি ট্রেন এসে পড়্‌লো,—ললিতা চলার গতি দিল বাড়িয়ে। ঐ না দূরে সিগনলের নীল আলো দেখা যাচ্চে! এখনো যে ললিতা আধেক পথ পার হ'তে পারেনি। সে পৌঁছবার পূর্ব্বেই ট্রেন এসে পড়্‌বে। তাকে না দেখতে পেলে তার বন্ধু ভাববে কি? বেচারা অনর্থক খুঁজে খুঁজে হায়রান হবে।

আধেক পথে, চৌমাথার বাঁকে সহদেবের দোকান। সেখানে পৌঁছবার পূর্ব্বেই তার দেহের ওপর ছড়িয়ে পড়লো তীব্র আলোকরশ্মি! টর্চ্চের আলো!

ললিতার দুর্ভাবনা গেল কেটে। সে ভেবেছিল হয়তো সহদেবকে ডাকাডাকি ক'রে জাগাতে হবে! কিন্তু, না, সহদেব তৈরি হ'য়ে তার অপেক্ষায় বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

সাম্‌নে এসে ললিতা বল্‌লে, শীগ্‌গিরী আসুন, গাড়ী আস্‌তে আর দেরী নেই।

সহদেব হাতদুটো ঘস্‌তে ঘস্‌তে বল্‌লে, সারারাত ঘুম হয়নি তোমার নিশ্চয়ই। কিন্তু ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নেই, ট্রেন আস্‌তে এখনো তিন কোয়াটার বাকি।

সহদেব টর্চ্চের বোতাম টিপে হাতঘড়িটার ওপর আলো ফেল্‌লে।

ললিতা ঘড়ির পানে চেয়ে সহদেবের মুখের পানে চাইলে।

দুজনে পাশাপাশি চল্‌লো। ললিতার চলার গতি গেল ক'মে। সহদেব সিগার ধরিয়ে বল্‌লে, উঃ! কী হাড়ভাঙ্গা শীত!

ললিতা বল্‌লে, একটু চল্‌লেই কমে যাবে। মাইল খানেক হেঁটে আমার শীত গেছে কমে।

সহদেব অন্ধকারে হাস্‌লে।

খানিকক্ষণ নিঃশব্দে চলার পর সহদেব জিগ্‌গেস করলে, তোমার বন্ধুর নাম কি ললিতা?

ললিতা অন্ধকারে সহদেবের মুখ দেখতে পেলে না, গলার স্বরেই তার কি-জানি-কেন মনে হ'ল সহদেবের কণ্ঠস্বরে ব্যঙ্গের আভাস!

ললিতা তেতে উঠ্‌লো। রূঢ়স্বরে উত্তর দিলে, কতবার বল্‌তে হবে। কাল তো বল্‌লুম, এবং 'তার'ও নিজে দেখলে।

—মাপ করো ভুলে গেছি তাই জিগ্‌গেস কর্‌ছি।

ললিতা বিরক্তির কণ্ঠে উত্তর দিল, নীতিশ চন্দ্র বসু।

—নীতিশ, নীতিশ! আমার স্মরণশক্তি ভারী দুর্ব্বল।

আবার দুজনে নীরবে চল্‌লো।

ললিতা বলে, একটু পা চালিয়ে চলুন, আবার প্লাটফর্ম্মের টিকিট কিন্‌তে হবে।

সহদেব বলে, সে জন্যে তোমার মোটেই দুর্ভাবনা নেই। আমি নিরাপদে তোমাকে প্লাটফর্ম্মে নিয়ে যাবো এবং নীতিশ বাবুকে খুঁজে বের কর্‌বো।

ললিতা নিঃশব্দে চলে।

সহদেব বলে, নীতিশ বাবু যে-কদিন এখানে থাক্‌বেন, সে কটা দিন অন্ততঃ তোমায় এখান থেকে যেতেই হয়, কি বল?

—সে পরে বিবেচনা করা যাবে। আর আমি ইচ্ছে করলেই তো থেকে যেতে পারিনে। পরের চাক্‌রী!

সহদেব ডাক্‌লে, ললিতা?

—কি?

—জিগ্‌গেস করতে পারি কি, কতো টাকা মাইনে তুমি পাও?

—বল্‌তে আমার কোন আপত্তিই নেই। আশী টাকা।

—তুমি চাক্‌রী ছেড়ে দাও।

—পাগল! আমার চল্‌বে কেমন করে?

—সে ভাবনা আমি ভাব্‌বো।

অন্ধকার না হ'লে দেখা যেতো ললিতার মুখের চেহারা কী রকম বদ্‌লে গেছে। পাংশু, বিবর্ণ মুখে রক্তের লেশমাত্র নেই। ঠোঁট দুখানা কাঁপ্‌ছে ঝড়ের মুখে ছেঁড়া পাতার মতো। সে কম্পিত কণ্ঠে উত্তর দিল, আপনার এ পাগলামীর কোন মানে হয় না, আমার ভাবনা আপনি ভাব্‌বেন কেন?

সহদেব বল্‌লে, তুমি অধিকার দিলে আমি সানন্দে সে ভার গ্রহণ কর্‌বো।

ললিতা বুঝলে, স্নেহপ্রাচুর্য্যে সহদেবের কণ্ঠস্বর উদ্বেল!

ললিতা প্রশ্ন করলে, কী রকমে?

সহদেব কিছুক্ষণ ভেবে উত্তর দিল, ধরো, আমি যদি তোমায় চাক্‌রী দিই, এবং ওর চেয়ে ভালো ব্যবস্থা ক'রে দিই।

—ভালো ব্যবস্থা হ'লে নিশ্চয়ই আমি সম্মতি দেব, কিন্তু কী চাক্‌রী আমায় দেবেন? আপনার লোকের কি প্রয়োজন?

—ধরো, যদি বলি আমার সেক্রেটারী হিসেবে তুমি আমার সমস্ত কাজকর্ম্ম দেখবে।

ললিতা সশব্দে হেসে উঠলো।

সহদেব জিগ্‌গেস করলে, হাস্‌লে যে?

—আপনার সেক্রেটারীর কাজ তো আপনার দোকানে ব'সে গল্প করা, লাইব্রেরীটা বড় জোর একটু দেখাশুনো করা আর চা তৈরি ক'রে খাওয়ানো—

সহদেব গম্ভীর হ'য়ে বাধা দিয়ে বললে, ধরো তাই, তাতে তুমি রাজী নও?

—তার জন্যে কত টাকা আমায় মাইনে দেবেন শুনি?

—কতো টাকা হ'লে তুমি থাক্‌তে পারো?

—আমি কেন বল্‌বো? আপনার প্রস্তাবটা কি আপনিই বলুন।

সহদেব বল্‌লে,ধরো,আরম্ভ করলে আড়াই'শোতে,—তারপর কাজ দেখে বাড়বে।

সহদেব ললিতাকে বেশ একটু চম্‌কে দিল। প্রথমটা সে যেন কেমন একটু থতমত খেয়ে গেল, কিন্তু পরক্ষণেই সে সংযত হ'য়ে অকুণ্ঠিত স্বরে প্রশ্ন করলে, মনে কিছু কর্‌বেন না সরকার মশাই, কিন্তু জিগ্‌গেস করতে পারি কি আপনার দোকানের আয়

কতো যে আপনি আমাকে আড়াই'শো টাকা মাইনে দেবেন ?

ললিতার প্রশ্ন ধারালো ছুরীর মতো সহদেবের বুকের অতি-বড় অহঙ্কারের স্থানটিতে আঘাত কর্‌লে। সে নিতান্ত অসহায়ের মত ছটফট কর্‌তে লাগলো, না পারল প্রতিবাদ কর্‌তে, না পারল সন্তোষজনক কোন উত্তর দিতে।

ষ্টেশনে পৌঁছে সহদেব বল্‌লে, নিজের আয়ব্যয় সম্বন্ধে বিবেচনা কর্‌বো আমি নিজে। সে ভাবনা তোমার নয়। তোমার কাছে জান্‌তে চাই, তুমি এতে রাজী কি না ?

সহদেবের কণ্ঠের দৃঢ়তা ললিতাকে দমিয়ে দিল। সে প্রচণ্ড বিস্ময়ে সহদেবের মুখের পানে চেয়ে বল্‌লে, আমাকে ভাব্‌বার সময় দিন্। আমি ভেবে উত্তর দেব।

ইণ্টার ক্লাশের একটা কম্পার্টমেণ্ট হ'তে মোটঘাট নিয়ে একটী দীর্ঘাঙ্গ, পাৎলা ছিপছিপে যুবক নেমে এলো। ললিতা তাকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে সহদেবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল।

ললিতা নীতিশকে বল্‌লে, সারারাত ঘুমুতে পাওনি তো, চোখমুখ ব'সে গেছে।

নীতিশ ম্লান হাসি হেসে উত্তর দিল, ইণ্টার ক্লাশের যাত্রীর আবার ঘুম ! বস্‌বার ঠাঁই মেলে না।

ললিতা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্লে।

১ ষ্টেশনের বাইরে এসে যখন তিনজনে দাঁড়ালো, অন্ধকার অনেকটা পাৎলা হয়ে এসেছে, দিগন্তে আলোর রেখা ফুটে উঠেছে, স্পষ্ট হ'য়ে ছড়িয়ে পড়তে পারচে না কুয়াশার জাল ছিঁড়ে। সেই অস্পষ্ট আলোর স্নিগ্ধতায় ললিতাকে দেখাচ্চে তাজা বিকশিত ফুলের মতো। সেই অস্পষ্টতার মাঝে সে যেন স্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌লো। পুষ্পিত শাখার মত সারা শরীরে জেগে উঠেছে মৃদু চাঞ্চল্য—দীর্ঘায়ত চোখে ফুটে উঠেছে অপরূপ দীপ্তি। তার কল্পনার রঙীন আকাশে কাঁপছে নীতিশ, স্তিমিত হ'য়ে আস্‌ছে সহদেব।

মুটের মাথায় বিছানা ও সুটকেশ দিয়ে তিনজনে চল্‌তে লাগলো। নীতিশের গা ঘেঁষে ললিতা চলেছে তার পাশে পাশে। ললিতা চপল পাখীর মতো নীতিশকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন ক'রে যাচ্ছে, নীতিশ কোনটার উত্তর দিচ্চে মিহিস্বুরে, কোনটার উত্তর দিচ্চে ঘাড় নেড়ে, চোখের ইঙ্গিতে। সহদেব তাদের পিছনে চুরুট টান্‌ছে একাগ্র মনে। অতল সমুদ্রের মতই সে গম্ভীর ও করুণ! ললিতা কিনারার ঢেউ—কল্লোল তুলছে, ফুলে উঠ্‌ছে, গড়িয়ে যাচ্চে।

সহদেবের দোকানে এসে তারা উঠ্‌লো।

ললিতা গেল চায়ের জোগাড়ে। সহদেবের সঙ্গে অল্পক্ষণেই নীতিশের আলাপ জমে উঠলো। সহদেব দেখলে ছেলেটি মিষ্টভাষী, আলাপ জমাতে ওস্তাদ। নীতিশ পুঙ্খানুপুঙ্খ দৃষ্টি দিয়ে সহদেবের দোকানটী দেখলে।

ঝিকিমিকি

চায়ের টেবিলে ব'সে সহদেব একাগ্র দৃষ্টি দিয়ে নীতিশের দিকে চেয়ে রইল। জাগরণক্লিষ্ট শ্রান্তমুখে উদ্দীপ্ত প্রতিভা, চোখ-দুটি চঞ্চল, দীপ্ত, তেজোময়। আয়ত ললাট কামনায় জ্বল্ জ্বল্ করছে। গরীব ব'লে যেমন তার কুণ্ঠা নেই, সঙ্কোচ নেই, শিক্ষার অহঙ্কারও নেই তেম্নি। সদাই সপ্রতিভ; হাস্‌বার একটা নিজস্ব ভঙ্গি আছে যা সকলকে মুগ্ধ করে।

পরণে মোটা খদ্দরের ধুতি, গায়ে খদ্দরের পাঞ্জাবীর ওপর একখানা আলোয়ান। নাকের ওপর মোটা সেলের চশমা। সৌন্দর্য্যবোধ আছে কিন্তু সৌন্দর্য্য পিপাসার উচ্ছৃঙ্খলতা তাকে অশোভন ক'রে তোলে নি, দীনতা আনে নি। দেহের কিনারায় অজস্র যৌবন কিন্তু সেই অজস্রতার মাঝে লুকিয়ে আছে সংযম, যা তার যৌবনকে উচ্ছল হ'তে দেয় নি, মাতাল ক'রে তোলে নি।

সহদেবের ছেলেটিকে ভালো লাগ্‌লো।

সহদেবের লাইব্রেরী ঘরটি দেখাতে দেখাতে ললিতা নীতিশকে বল্‌লে, এঁর সঙ্গে আমার এত বন্ধুত্ব জমেছে কেন বুঝতে পার্‌ছো? এই দু'টি মাস ইনি আমার মনের খোরাক জুগিয়েছেন। স্বাস্থ্য ফিরে পাবার জন্তে এখানে আসা বটে কিন্তু মনকে একেবারে উপবাসী রেখে স্বাস্থ্য ফিরে পাওয়ার তো কোন মানে হয় না। এঁর আশ্রয় আমার সেই দিকটা বাঁচিয়েছে। এখানে আমার বন্ধু বল্‌তে ইনিই একা।

নীতিশ বল্‌লে, চমৎকার! মস্তিষ্কের খোরাক না হ'লে কি . -

মানুষ বাঁচে! পশ্চিমের হাওয়া খেয়ে দেহ ফুর্তিতে থাক্‌বে আর মস্তিষ্কটা নিষ্ক্রিয় হ'য়ে একপাশে প'ড়ে থাক্‌বে, তা কি চলে! মাপ কর্‌বেন মিঃ সরকার, যদি কিছু মনে না করেন, যে ক'দিন এখানে থাকি দুপুরটা আমি এখানেই কাটাবো। মাঠে-ঘাটে দুপুরের হাওয়া খাওয়া আমার ধাতে সইবে না।

ললিতা উচ্চ হাসিতে ঘরখানা প্রকম্পিত ক'রে তুলে বল্‌লে, তা হ'লেই শরীর সেরেছে আর কি? শীতের দিনে, দুপুরে ঘুরে বেড়ানো চমৎকার! লম্বা পাড়ি দিতে হ'লে দুপুরে ভিন্ন সময় হবে কেন?

সহদেব বল্‌লে, তা ঠিক্‌। তবে আপনার বন্ধুটির যেরকম ঘুরে বেড়াবার বাতিক, দুদিন ওঁর সঙ্গে বেড়ালেই আপনার সখ মিটে যাবে। বৃষ্টি বাদলের হাওয়া খেতেও ওঁর বাধে না।

নীতিশ চশমাটা রুমালে মুছতে মুছতে বাঁকা চাউনীতে ললিতার পানে চাইলে।

ললিতা সলজ্জ হাসিতে মুখ ভ'রে বল্‌লে, বাঃ রে, তা না হ'লে টাকা খরচ ক'রে এখানে আস্‌বার দরকার কি?

সহদেব ও নীতিশ হাস্‌লে ললিতাকে কেন্দ্র ক'রে।

বারো

এতদিন ছিল ললিতা একা, সহদেবের কল্পনায়, স্বপ্নে, জাগ্রত চিন্তায়। নীতিশ এসে ভিড় বাড়ালে, সহদেবের কল্পনায়-গড়া সংসারটিতে। সংসারের শ্রী বাড়লো নূতন অতিথির আগমনে। সহদেবের চিন্তার গতি ধারা বদ্‌লালে। নূতনভাবে নূতনতর পথে ললিতাকে ও নীতিশকে পাশাপাশি নিয়ে সহদেবের চিন্তা পাখা মেলে দিল। ললিতাকে আর একা ভাবা চলে না, ললিতাকে ভাবতে গেলেই ললিতার সঙ্গে আসে নীতিশ! তাকে কিছুতেই দূরে রাখা যায় না।

বাস্তবেও ঠিক তাই!

ললিতা আর একা আসে না। আসে নীতিশের সঙ্গে, লাইব্রেরীতে ব'সে পড়াশুনো করে, আলোচনা করে নীতিশের সঙ্গে, ফিরে যায় নীতিশের সঙ্গে।

কাজেই সহদেব আর শুধু ললিতাকে মনে করতে পারে না।

নীতিশের সাহচর্য্যে ললিতা যেন সহসা বিকশিত হ'য়ে উঠলো। যৌবন তার বিস্ফারিত হ'য়ে উঠলো দেহের কানায়

কানায়, বর্ষার নদীর মতো। লজ্জার আভা তার সারা দেহ রাঙিয়ে দিল। সহদেব ভাবে এত রঙ্ কোথা লুকিয়েছিল। কিশলয়হীন তরুশাখা যেন কার প্রভাব স্পর্শে সহসা ফুলে-ফলে রাঙা হ'য়ে উঠলো। সহদেব বিস্ময়ে ললিতার পানে চায়।

ললিতা উদ্দাম নদীর মতো তর্ তর্ ক'রে ছুটতে থাকে। তার অবসর নেই, বিশ্রাম নেই, শূন্যে পাখা মেলে দিয়ে সে শুধু উড়তেই থাকে।

নীতিশ কিন্তু গভীরতায় অচঞ্চল। তার মাঝে চাঞ্চল্যের সাড়াটুকু নেই। সে যেন আপনভোলা।

সহদেব লক্ষ্য করে, নীতিশ বই পেলে ললিতাকে ভুলে যায়, বিশ্বসংসার ভুলে যায়। নীতিশ যখন বইয়ের মাঝে মগ্ন হ'য়ে যায়, ললিতা তার সঙ্গে কথাটি বল্‌তে ভরসা করে না।

নীতিশ বলে, খাসা লোক, ললিতা, তোমার এই সরকার মশায়!

ললিতা ঘাড় নেড়ে উত্তর দেয়, চমৎকার! মানুষ হিসেবে ওঁর তুলনা নেই। তা না হ'লে আর আমি বেছে বেছে ওঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব করি!

নীতিশ প্রশ্ন করে, ওঁর আর কে আছে ললিতা?

—কেউ নেই।

—আমার মনে হয়, ললিতা, ভদ্রলোকের জীবনের অন্তরালে অনেক ব্যথা জমা হ'য়ে আছে। দুঃখের অভিজ্ঞতাই ওঁকে মানুষ ক'রে তুলেছে।

—এতদিনেও ওঁর ঠিক পরিচয় সংগ্রহ করতে পারিনি, তবে দুঃখের সঙ্গে যে ওঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে সে কথা উনি নিজেই ব'লেছেন। দুঃখের সঙ্গে লড়াই ক'রে উনি জয়ী হ'য়েছেন।

—আর্থিক অবস্থা এখন ভাল মনে হয়।

ললিতা একটু ভেবে উত্তর দেয়। বলে, স্বচ্ছল মনে হয়। তবে ঠিক কেমন ক'রে জান্‌বো। উনি আমায় আড়াইশো টাকা মাইনে দিয়ে ওঁর সেক্রেটারী রাখতে চান, যদি আমি আমার চাক্‌রী ছেড়ে দিতে রাজী হই—

নীতিশ বিস্ময়ে ললিতার পানে চেয়ে বলে, বলো কি? ওঁর সেক্রেটারী?

—তাই তো বলেন।

নীতিশ বলে, ভদ্রলোকের আর কোন কাজকর্ম্ম আছে না শুধু এখানের এই দোকান?

—ঠিক বুঝতে পারি নি। তবে এখানের দোকানে যা আয় হয় তাতে আড়াইশো টাকা মাইনে দিয়ে লোক রাখা চলে না।

নীতিশ নিঃশব্দে ললিতার পানে চায়।

ললিতা বলে, সরকার মশায়ের অন্তরটা একেবারে ছেলে মানুষের মতন। আমার ভারী ভালো লাগে।

ললিতা কি ভেবে সহসা উচ্চ হাসিতে ঘরখানা কাঁপিয়ে তুলে নীচু গলায় নীতিশকে বলে, আমার মাঝে মাঝে মনে হয় আমি ভদ্রলোকের প্রেমে পড়ছি।

নীতিশ হেসে বলে, মন্দ কি! সত্যিই আমি তোমার সৌভাগ্য কামনা করি।

ললিতা বলে, যদি প্রেমে পড়তে হয়তো ঐ রকম একজন রাশভারী লোকের প্রেমে পড়াই ভালো।

নীতিশ বলে, প্রেমটা খুব গভীর হয়, আর অবসর প্রচুর মেলে।

ললিতা নীতিশের গায়ে ধাক্কা দেয়।

নীতিশ প্রশ্ন করে, তা তুমি একাই প্রেমে পড়ছ না, ওদিকেরও সাড়া পাচ্ছ?

চোখ মুখ ঘুরিয়ে ললিতা বলে, তবে না তো কি! আমি একাই বুঝি? ইস্!

নীতিশ মনে মনে হাসে আর মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখে ললিতার সলজ্জ যৌবনশ্রী!

ললিতা এক সময় নীতিশের গা ঘেঁসে নীচু গলায় জিগগেস করে, সত্যি একটা পরামর্শ দাও না, কী করা যায়?

নীতিশ প্রসারিত স্তব্ধ দৃষ্টি দিয়ে ললিতার মুখের পানে চায়।

ললিতা বলে, কী যে হাঁ করে মুখের পানে চেয়ে থাকো, ভাল লাগে না। বল না সত্যি, কী করা যায়?

নীতিশ প্রশ্ন করে, কিসের পরামর্শ? ওঁর প্রেমে পড়বে কি না? এ কিন্তু চমৎকার! পরামর্শ ক'রে প্রেমে পড়তে আজ পর্য্যন্ত কারুকে শুনি নি।

ললিতা চোখ রাঙিয়ে বললে, যাও! তুমি ভারী দুষ্টু হোচ্চ! আমি কি তাই বলচি?

নীতিশ অপাঙ্গে ললিতার পানে চেয়ে গম্ভীর হ'য়ে জিগগেস করলে—তবে?

—বলছিলুম কি, ঐ যে উনি চাকরী ছেড়ে দিয়ে ওঁর সেক্রেটারী হবার কথা বলছেন, তার কি করা যায়?

—ও সেক্রেটারী হওয়ার চেয়ে একেবারে পাকাপাকি ব্যবস্থা ক'রে নিয়ে চাক্‌রী ছেড়ে দেওয়াই ভালো—

—কি রকম?

—এদিকে তো খুব বুদ্ধি আছে আর এই সাদা কথাটা বুঝতে পারলে না? সেক্রেটারী হওয়াটা কি জানো—এই যাকে বলে প্রস্তাবনা, তারপর আসল নাটক হবে সুরু এবং উপসংহারে মিস্ সেক্রেটারী হবে মিসেস্ সরকার। আমার মনে হয় কাজ কি অতো ঝঞ্ঝাটে, তার চেয়ে একেবারে মিসেস্ সরকার হ'য়ে ওঁর স্কন্ধে নিশ্চিন্তে আরোহণ করো। দেখ্‌বে আর কোন গোলযোগ থাকবে না।

ললিতা ভ্রূকুটি ক'রে বললে, সে তো আমার সৌভাগ্য!

—নিশ্চয়! বৃদ্ধের তরুণী ভার্য্যা।

—বুড়ো ব'লোনা বলছি। বুড়ো কিসে দেখলে? ও বয়সে বিয়ে সব দেশেই হ'য়ে থাকে, তারা তো বুড়ো ভাবে না!

নীতিশ হেসে উঠলো।

ললিতা আরো একটু উত্তেজিত স্বরে বল্‌লে, আমিই বা কী

এমন কচিখুকী! এদেশের ব্যবস্থা ধরলে তো আমারো বিয়ের বয়স পার হ'য়ে গেছে।

নীতিশ বললে, চমৎকার হবে ললিতা, খাসা হবে। ও আমি ঠাট্টা করছিলুম, বুঝ্‌লে না?

ললিতা সাড়ীর আঁচলটা পিঠের ওপর গোছাতে গোছাতে জিগগেস্ করলে, তাহলে তোমার অমত নেই?

—মোটেই না। তোমার মতেই আমার মত।

—আচ্ছা তা হ'লে বসো। চা নিয়ে আসি আর দেখে আসি সরকার মশায়ের ছুটি হলো কিনা।

নীতিশ বললে, শুধু চা না কিছু মিষ্টি মুখের ব্যবস্থা আছে?

—চায়ে বেশী ক'রে চিনি দোব'খন।

চঞ্চল লীলাভঙ্গীতে ললিতা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নীতিশ মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেল্‌লে।

খানিক পরে ললিতা এসে বল্‌লে, চলো, আজ ফাঁকায় ব'সে চা খাওয়ার সখ হ'য়েচে। টেবিল সাজিয়ে সরকার মশায় ব'সে আছেন।

নীতিশ বল্‌লে, তা হ'লে ব্যবস্থাটা ভালই হবে নিশ্চয়। জায়গায়টার জলের গুণ আছে, এই ভাবে খিদে বাড়লে ভাবনার লক্ষণ।

ললিতা জিগ্‌গেস করলে, কী রকম?

—এরকম খিদে নিয়ে কারুর অতিথি হ'য়ে থাকা, যেন কেমন কেমন ঠেকে।

—তা হলে কী করতে চাও ?

—করতে আমি কিছু চাইনি, তবে অন্য কেউ হ'লে নিশ্চয়ই তার চক্ষুলজ্জায় বাধ্‌তো,—অবশ্য যার চক্ষুলজ্জা আছে।

—তুমি বলতে চাও তোমার চক্ষুলজ্জা নেই ?

নীতিশ গম্ভীর ভাবে ঘাড় নেড়ে বল্‌লে, না, ও বালাই আমার নেই।

ললিতা হাস্‌লে।

তেরো

অনেকখানি রাত্রি হ'য়েছে।

সহদেব আপাদমস্তক কম্বলে ঢেকে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাব্‌ছে। ঘুম আস্‌ছে না। চিরসুপ্ত যৌবন তার জেগে উঠেছে। সে ঘুমোতে চায় না। কিছুতেই তাকে সে ঘুমোতে দেবে না।

ললিতাকে ঘিরে তার যৌবন উত্তাল হ'য়ে ওঠে। ললিতা তার মস্তিষ্কের অলিতে-গলিতে তরল বহ্নিস্রোতের মতো গড়িয়ে বেড়ায়।

নিস্পন্দের মতো শুয়ে শুয়ে সে ভাবে ললিতাকে—কেমন ক'রে তার যৌবনের গোধূলিতে তার প্রথম আবির্ভাব হ'লো, কেমন ক'রে সে রাঙিয়ে তুল্‌লে তার যৌবনের আকাশকে!··· ঘুমকাতর দেহ তার অবসাদে এলিয়ে পড়ে, মন তার চিন্তার উত্তেজনায় সোজা হ'য়ে ওঠে।

মাঝে মাঝে তার চিন্তার খেই হারিয়ে যায়। নীতিশ এসে ললিতাকে আড়াল ক'রে দাঁড়ায়। এই নীতিশ তার উচ্ছল

যৌবন আর অপর্য্যাপ্ত তারুণ্য নিয়ে ললিতাকে তার কাছ হ'তে ছিনিয়ে নিতে যায়। সহদেবের মস্তিষ্কে আগুন ধ'রে ওঠে। একটা কুগ্রহের মতো কোথা হ'তে এই নীতিশ এসে জুটলো!

ললিতা যদি চলে যায়! তার প্রাণের সমস্ত আলো যাবে নিভে। তার জীবন দুর্ব্বহ হ'য়ে উঠ্‌বে।

রাত্রি গভীর হ'তে গভীরতর হ'য়ে আস্‌ছে। বাইরে স্তব্ধতার প্রকাশ প্রখর হ'য়ে উঠ্‌ছে। নিজের নিশ্বাসের শব্দ আঁধার ঘরের স্তব্ধতায় প্রতিধ্বনিত হ'য়ে ফিরে আস্‌ছে।

সহদেব শিউরে ওঠে।

কখন এক সময় সহদেব তন্দ্রার ঘোরে অচেতন হ'য়ে গিয়েছিল, তার ঘুম ভেঙ্গে গেল কিসের শব্দে।

তার বাইরের জানালায় কে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে তাকে ডাক্‌ছে। সহদেব ধড়মড়িয়ে উঠে বস্‌লো।

—বাবুজী? বাবুজী?

আলো জ্বেলে সহদেব দরজা খুলে দিলে।

—কিষণ? কী খবর রে কিষণ?

কিষণ ললিতার চাকর।

কিষণ বল্‌লে, মা'জি আপনাকে ডেকে পাঠালেন, ভারী জরুরী দরকার।

সহদেব বিস্ময়ের আতিশয্যে স্তব্ধ হ'য়ে গেল।

কিষণ বল্‌লে,—যে বাবু এসেছেন সেদিন, তাঁর বিমারী হ'য়েছে, তাই মা'জী আপনাকে ডাক্‌লেন।

সহদেব কাপড়টা বদ্‌লে নিয়ে তাড়াতাড়ি কিষণের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লো।

নীতিশের এমন কি ব্যারাম হ'তে পারে, যার জন্যে ললিতা এমন আকুল হ'য়ে তাকে এই রাত্রে ডাক দিল! রাত্রি ন'টা পর্য্যন্ত তো সে ললিতার সঙ্গে লাইব্রেরীতে ব'সে পড়াশুনো ক'রেছে, সহদেবের সঙ্গে গল্প করেচে। এম্‌নি সহস্র ভাবনার মাঝে ডুবে সহদেব পথ চল্‌তে লাগ্‌লো। রাত্রি প্রায় দু'টো। জনহীন পথ,—স্তব্ধ, অন্ধকার। গাছের মাথায় পাতার মৃদুমর্ম্মর ও পাখীর ডানা-ঝাপ্টানীর শব্দ। সহদেব দ্রুতপায়ে এগিয়ে চল্‌লো। গতির তালে তার দেহে শক্তিসঞ্চার হ'চ্চে, উত্তেজনায় শিরায় শিরায় রক্তের জোয়ার বইচে। মাথার ওপর নিকষ কালো আকাশ, মাঝে মাঝে ছেঁড়া পাঁশুটে রঙের মেঘ জমেছে। এক কোণে ক'টা তারা জ্বল্‌চে মিট্‌ মিট্‌ ক'রে। সহদেবের ওপরপানে চেয়ে মনে হয় অবসাদে ঢুলে ঢুলে আকাশটা যেন অনেকখানি নীচে ঝুলে পড়েছে। এতো কাছে যে এর দূরত্ব মাপ করা চলে। পায়ের নীচে পৃথিবীর পানে চেয়ে আবার মনে হয় পৃথিবীটা যেন ঝিমুচ্চে আর ওপরপানে উঠ্‌ছে। আকাশটা আস্‌চে নীচের পানে আর পৃথিবীটা উঠ্‌ছে উপরপানে, আকাশে পৃথিবীতে মিল্‌তে চায়।

সহদেব চলার গতি দিল বাড়িয়ে। উর্দ্ধশ্বাসে স্খলিত চরণে সে চল্‌লো।

সাম্‌নের কম্পাউণ্ডটা পার হ'য়ে উঠানের সিঁড়ি বেয়ে উঠ্‌তে উঠ্‌তে সহদেব উর্দ্ধস্বরে ডাক্‌লে, ললিতা?

পাশের একটা দরজা খুলে ললিতা বল্‌লে, ভেতরে আসুন, নীতিশ বাবুকে নিয়ে বড় মুস্কিলে পড়েচি—

—হঠাৎ তাঁর হলো কি? সন্ধ্যেবেলা তো তাঁকে মোটেই অসুস্থ মনে হলো না।

—না, পথে আস্‌তে আস্‌তে বল্‌লে, মাথটা কেমন করচে। তারপর এখানে আসার ঘণ্টাখানেক পরেই অজ্ঞান হ'য়ে গেলো।

ললিতার মুখে আতঙ্কের ছায়া, চোখদু'টি অশ্রুতে টলমল কর্‌চে।

সহদেব ঘরের মাঝে ঢুকে অচেতন নীতিশের বিছানার পাশে গিয়ে বস্‌লো। নীতিশের মুখে যন্ত্রণার রেখা, কণ্ঠনালীর মাঝে একটা ঘড়্‌ ঘড়্‌ ক'রে আওয়াজ হচ্চে, চোখদু'টো জবার মতো লাল হ'য়ে উঠেচে। মুখের পানে চেয়ে সহদেব শিউরে উঠ্‌লো।

ললিতা নিতান্ত অসহায়ের মতো আর্ত্তস্বরে বল্‌লে, কী হবে সরকার মশায়?

সহদেব জিগ্‌গেস করলে, ডাক্তার ডেকেছিলে?

—হ্যাঁ, হোমিওপ্যাথী ওষুধ খাইয়েছি, ডাক্তার বল্‌লেন, সন্ন্যাসরোগ। মাথায় বরফ দিতে বল্‌লেন, কিন্তু বরফ এখানে পাই কোথায়?

সহদেব বল্‌লে, তুমি ব্যস্ত হয়োনা, মাথায় জল দিয়ে হাওয়া করো, আমি হাঁসপাতালের ডাক্তারকে নিয়ে আস্‌চি।

তিন দিন তিন রাত্রি মৃত্যুর সঙ্গে সমানভাবে যুদ্ধ ক'রে চতুর্থ দিনে নীতিশের জ্ঞান ফিরে এলো। ললিতার অক্লান্ত সেবা ও সহদেবের অকাতর পরিশ্রম ও অজস্র অর্থব্যয় নীতিশকে মৃত্যুর দ্বার থেকে ফিরিয়ে আন্‌লে।

দ্বিতীয় দিন রাত্রে কল্‌কাতা থেকে এলো সাহেব ডাক্তার ও মেম নার্শ। নার্শের হাতে নীতিশের সেবার ভারটুকু তুলে দিয়ে ললিতা ছুটি পেলে। ছুটি পেলে কিন্তু সে হাঁপ ছাড়তে পারলে না, রুদ্ধনিঃশ্বাসে উদ্বিগ্ন ও সজাগ হ'য়ে রইলো। ডাক্তার আশ্বাস দেয় তবুও যেন ললিতা বিশ্বাস করতে পারে না। সে ছট্‌ফট্‌ ক'রে এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে বেড়ালে। রোগীর পাশের ঘরে দেখা মিল্‌লো সহদেবের। শ্রান্ত দেহটা একখানা তক্তাপোষের ওপর এলিয়ে দিয়ে সে আড় হ'য়ে শুয়ে আছে।

ললিতার ডাক পড়লো।

বিশুষ্ক মুখে ললিতা এসে সহদেবের মাথার কাছে দাঁড়ালো। সহদেব বল্‌লে, বসো।

ললিতা নিঃশব্দে তক্তাপোষের প্রান্তে বস্‌লো। রুক্ষ চুলগুলো মুখের ওপর ছড়িয়ে পড়লো। তার মুখের ভাব দেখেই সহদেব বুঝেছিল সজল মেঘের মতোই মনটা তার ভারাক্রান্ত—

চোখের পিছনে অশ্রুর সমুদ্র। হলোও ঠিক্ তাই! সহদেব নিজের হাতের মাঝে ললিতার একখানি হাত তুলে নিতেই ললিতার গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়লো ফোঁটায় ফোঁটায় অশ্রু। ললিতার অন্তরে যে ব্যথা ফেনিয়ে উঠেচে তার আন্দোলনটা এসে লেগেচে ওর মনে। ললিতার সম্বন্ধে সহদেবের ধারণা ছিল, সে শক্ত—অধীর নয়, কিন্তু নীতিশের ব্যারামের পর প্রথম দর্শনেই তার ধারণা উলটে গেল। স্বভাবের নিয়মই নিয়ম। নারী নারীই! ললিতা অঝোরে কাঁদলে। যা-তা একটা কিছু ব'লে সহদেব তাকে সান্ত্বনা দিতে চাইলে, কিন্তু তার কণ্ঠরোধ হ'য়ে এল, কোন কথাই তার মনে এলো না। সে শুধু নিজের মুখের উপর ললিতার হাতখানাকে শক্ত ক'রে চেপে ধ'রে স্বপ্নের ঘোর-লাগা চোখে ললিতার মুখের পানে চেয়ে রইলো।

এক সময় ললিতার মুখের ওপর থেকে রুক্ষ উড়ো চুলগুলোকে সরিয়ে দিতে দিতে সহদেব বল্‌লে, বিপদের মুখে ভেঙ্গে পড়া তো তোমার মত মেয়ের উচিত নয়। যারা সাধারণ, অতি সাধারণ তারাই দিশেহারা হবে বিপদে। বিপদ যখন এসেচে তখন তাকে মেনে নিতে হবে, এবং তার সঙ্গে বীরের মতো লড়াই দেবার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে।

ললিতা চোখ নীচু ক'রে বসে রইলো, জবাব দিলে না।

সহদেব প্রশ্ন করলে, নীতিশের আত্মীয়ের মধ্যে এমন কেউ আছেন, যাকে সংবাদ দেওয়া প্রয়োজন মনে করো?

ললিতা তেম্‌নি চোখ নীচু ক'রে উত্তর দিলে, ঠিক জানি না।

—আমি শুয়ে শুয়ে তাই ভাবছিলুম।

ললিতা সহসা সহদেবের বুকের উপর ঝুঁকে পড়ে ভিজে গলায় বল্‌লে, আপনার চেয়ে পরমাত্মীয় আমাদের কেউ নেই। যদি বাঁচে সে শুধু আপনার জন্যে।

সহদেবের চোখ দু'টো ভিজে উঠলো। তার দুরন্ত মন ফুলে ফুলে কেঁপে উঠ্‌লো। সে সহসা দু'হাত দিয়ে ললিতার ঝুঁকে পড়া দেহটাকে নিজের বুকের মাঝে চেপে ধরলে।

ললিতা নড়লো না, ওঠ্‌বার চেষ্টা করলো না, তার শ্রান্ত দেহটা সহদেবের বুকের উপর নরম হ'য়ে এলো। সে কম্পিত ভাঙ্গা গলায় বল্‌লে, কিন্তু কেন এমন হলো সরকার মশাই?

সহদেব শুধু স্তব্ধ হ'য়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌লে। ঝড়ের বেগে সে-দীর্ঘশ্বাস সহদেবের পাঁজর ক'খানাকে এবং ললিতাকে সবেগে কাঁপিয়ে তুললে।

চোদ্দ

নীতিশ আরোগ্যের পথ ধরলে, সহদেব আশ্বস্ত হলো এবং ললিতার মুখে হাসি ফুটলো। জ্যোৎস্নার ধারার মত সে-হাসি সহদেবের হৃদয়-আকাশ ছেয়ে ফেল্‌লে। প্রাণের প্রাচুর্য্যে ললিতা যেন ধৈর্য্য হারিয়ে ফেল্‌লে। বিপদের দিনে যেমন আঁধারের ছায়া তার মুখখানিকে কালো ক'রে দিয়েছিল, তেম্‌নি সেই বিপদের অবসানে চঞ্চল প্রজাপতির মত সে রঙের বৈচিত্র্যে উড়ে বেড়াতে লাগল মহানন্দে। সহদেব ভাবের আবেগে অপলকে চেয়ে থাকে ললিতার মুখের পানে। নীতিশের ব্যারামের সময় ললিতা ওর বুকের মাঝে নিবিড় হ'য়ে একান্তভাবে আশ্রয় নিয়েছিল, কোন কথাই সে সহদেবকে বলেনি, অথচ কোন কথাই তার কাছে সে গোপন রাখে নি। সেই দিনই ওর জীবনটা অকস্মাৎ নিজের কাছে দেখা দিয়েছিল নানা রঙে, নানা বর্ণে। সেই দিনের পর থেকেই সে নিজের অস্তিত্বের সার্থকতা বুঝেছিল, এবং সেই পরম মুহূর্ত্তটীকেই পাথেয় ক'রে জীবন নদীতে পাড়ি দিতে পারে। আর তার জীবনে কোন

প্রার্থনা নেই, কোন কামনা নেই। ললিতা ঐ একটি দিনে তাকে অনেকখানি পথ এগিয়ে দিয়েছে। এতদিন যা কঠিন ছিল, আজ তা নিঃশ্বাসের মতো সহজ ও হাসির মতো সরল হ'য়ে উঠেছে।

ললিতা বলে, নীতিশকে বাঁচিয়েছেন আপনি।

সহদেব মনে মনে বলে, নীতিশের অসুখ আমার জীবনকে সফল করেছে। সারা জীবনের ব্যর্থতা ঘুচিয়েচে।

আর নীতিশ ?—নীতিশ বিহ্বল দৃষ্টি দিয়ে তাদের মুখের পানে চেয়ে থাকে। কৃতজ্ঞতার অশ্রুতে চোখ দুটী ভারী হ'য়ে ওঠে।

নীতিশের জন্যে ললিতার বেড়াতে যাওয়া হয় না। সহদেবও দিনের অধিকাংশ সময় ললিতার বাসাতেই থাকে, মাঝে মাঝে দোকানে গিয়ে দেখাশুনা ক'রে আসে। সে সময়টুকুও তার মন পড়ে থাকে ললিতার বাসায়।

নার্শকে ছুটি দেওয়া হয়েচে। নীতিশের সেবার ভার নিয়েচে ললিতা, কাজেই ললিতা চব্বিশঘণ্টাই ব্যস্ত থাকে নীতিশকে নিয়ে। মাঝে মাঝে নীতিশ যখন সুস্থ হয়ে ঘুমোয়, ললিতা চঞ্চল হাওয়ার মতো ছুটে আসে সহদেবের কাছে। ললিতা তার কথায়, হাসিতে, চাঞ্চল্যে সহদেবের স্নেহাসক্ত মনকে উধাও ক'রে নিয়ে যায়। সহদেব সুখস্বপ্নে বিভোর হ'য়ে ললিতার মুখের পানে চেয়ে থাকে।

ললিতা কণ্ঠস্বরে খুব খানিকটা স্নেহ ঢেলে বলে, তোমার গলায় পড়ে কী কষ্টটাই তোমায় দিলুম এবং দিচ্চি।

সহদেব বলে, আজো যে একেবারে তোমার কাছে সস্তা হয়ে যাইনি, সেই আমার সৌভাগ্য।

ললিতা জিগ্‌গেস করে, কী রকম?

সহদেব ললিতার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলে, আমার দাম সংসারে কেউ বোঝে নি, তুমি ছাড়া—

—সেটা এমন আশ্চর্য্যের কথা নয়।

—কারণ?

—কারণ, আমি যে-চোখে তোমায় দেখেচি, যেমন ক'রে তোমায় চিনেছি, তেমন ভাবে আর কেউ তোমায় দেখবার বা চেন্‌বার চেষ্টা করে নি।

সহদেবের মুখখানা আরক্ত হ'য়ে ওঠে। সে বলে, দৈবাৎ এমন ভাবে আমাকে তুমি বেছে নিলে কেন ললিতা?

—পাঁচজনের মধ্যে থেকে চিন্‌তে তোমায় কষ্ট হলো না মোটেই। দেখেই তোমায় চম্‌কে উঠেছিলুম, বেশ বুঝেছিলুম এ মানুষটি একেবারে নিজের মতো।

সহদেব তাকে কাছে টেনে নিয়ে নিচু স্বরে জিগ্‌গেস করে, আর এখন?

ললিতা তার গায়ে ধাক্কা দিয়ে বলে, জানি না, যাও।

ললিতা হাস্‌তে হাস্‌তে বেরিয়ে আবার নীতিশের ঘরে গিয়ে দেখে নীতিশ জেগেচে কিনা। হয়তো নীতিশ তখনো ঘুমুচ্চে। ললিতা নিঃশব্দে তার বিছানার ধারে এসে বসে। অলস মনকে ভাসিয়ে দেয় অবারিত আকাশের বুকে ঐ ছেঁড়া

পাতলা মেঘের মত। কিছুতেই এক হ'য়ে তাদের জমতে দেয় না।

তার মনের মাঝে অসাধারণের ছোঁয়াচ লেগেচে, সাধারণের বেড়া ভেঙ্গে যে স্বর্গে বিচরণ করচে, সেখান থেকে সে নামতে চায় না। নীতিশের শীর্ণ ঘুমন্ত মুখের পানে চেয়ে দেখে, মেঘে আকাশটা যেমনি ম্লান, নীতিশের মুখের চেহারাটাও তেমনি। সে মুখে আবার হাসি ফোটাতে হবে তাকে, আলোর দীপ্তি আনতে হবে তাকে। সংসারে আপন জন বলতে তার কেউ নেই। বড় নিঃসহায় সে। ললিতার চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হ'য়ে আসে—ভাবের আবেগে তার মুখখানা লাল হ'য়ে ওঠে। সে নিজের মুঠোর ভেঁতর ঘুমন্ত নীতিশের একখানা হাত তুলে নিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে মনের কথা ব্যক্ত করে। সহসা নিজের গণ্ড ও আর্দ্র চোখের ওপর সেই আলগা হাতখানির স্পর্শ ঠেকিয়ে ধীরে ধীরে হাতখানিকে নামিয়ে রাখে। চোখ তুলে দেখে, দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সহদেব। কখন যে সে এসে দাঁড়িয়েচে ললিতা জানতেও পারে নি, তাই সে অপ্রতিভ ও কুণ্ঠিত হ'য়ে চোখ দু'টি নামিয়ে নেয়। আনত মুখের রক্তিম আভা আস্তে আস্তে যায় মিলিয়ে, বিবর্ণ গণ্ড বেয়ে দু'চোখ থেকে দরদর ক'রে জল গড়িয়ে পড়ে।

তার কুণ্ঠিত ব্যথিত মূর্ত্তি, সজল চোখের নিষ্প্রভ চাউনি সহদেবকে আকুল ক'রে তুললে। অথচ ঠিক্ সে বুঝে উঠলো না এরই মধ্যে এমন কি কারণ ঘটলো যা ললিতাকে এমনি ভাবে বিভ্রান্ত ক'রে ফেললে।

সে আস্তে আস্তে ললিতার একখানি হাত ধ'রে নীতিশের ঘর থেকে তাকে তুলে নিয়ে এলো।

ললিতা ব্যথিত স্বরে বল্‌লে, তোমায় সব কথা বল্‌বো কেমন ক'রে আমি?

সহদেব ব্যাকুল হ'য়ে মিনতি করলে, বলো ললিতা, তোমায় অনুনয় কর্‌ছি, আমার কাছে গোপন ক'রো না।

ললিতা বল্‌লে, আমায় মাপ করো, মিছে কথা বলার চেয়ে গোপন রাখা ঢের ভালো—

এর পর আর সহদেবের মুখে কথা ফুট্‌লো না। বেলাশেষের অস্তরাগ রঞ্জিত নিঃশব্দ আকাশের পানে মুখ রেখে দু'জনে থেমে গেল।

এর পর পীড়াপিড়ী করা ওর পক্ষে নির্লজ্জতা, কাজেই শরীর ও মনের উপর একটা বেদনা ব'য়ে নিঃশব্দে সহদেব ক'টা দিন কাটিয়ে দিলে।

ললিতা লক্ষ্য করে, তার মুখের উপর একটা ম্লান ছায়া পড়েছে। সে কিন্তু নিজের মনকে সংযত ক'রে ফেলেছে। তার মুখে একটি নির্লিপ্ত শান্তি!

সহদেব অন্যমনস্ক গাম্ভীর্য্যে তার মুখের পানে চেয়ে দেখে।

সায়াহ্নের অস্তগামী সূর্য্যের শেষ চিহ্নটুকু তখনো আকাশের বুক থেকে মুছে যায় নি। বারাণ্ডার এক কোণে একখানা

আরাম চৌকিতে নীতিশ শুয়েছিল। পাশে ললিতা তার মাথার চুলে আঙুল ডুবিয়ে তাব সঙ্গে গল্প করছিল।

নীতিশ বল্‌লে, মিঃ সরকারের চেহারাটা কিন্তু ক'দিন থেকে যেন ভাল দেখাচ্চে না, কেমন যেন শুকিয়ে যাচ্ছেন আর ভারী অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছেন।

ললিতা বল্‌লে, কই আমি তো লক্ষ্য করি নি—ও কিছু না।!

নীতিশ কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে আস্তে আস্তে জিগ্‌গেস করলে, আচ্ছা ললিতা, এই ব্যারামে ভদ্রলোক যে এতগুলো টাকা খরচ করলেন,—

ললিতা মুখখানা শক্ত ক'রে বল্‌লে, তা কি হবে?

—ভাব্‌চি, এ ঋণ শোধ করবো কেমন করে?

—সে পরে বোঝা যাবে। উনি ত আর উকিলের চিঠি দিয়ে তাগাদা করচেন না।

নীতিশ নিঃশব্দে হাস্‌লে।

একসময় নীতিশ আবার ডাক্‌লে, ললিতা!

ললিতা পা ঝুলিয়ে আরাম চৌকির হাতলের উপর বস্‌লো।

নীতিশ তার কোলের উপর একখানি হাত রেখে ব্যথিত স্বরে বল্‌লে, দরিদ্র হ'য়ে বেঁচে থাকার কী জ্বালা ললিতা! তাই ভাব্‌চি, যন্ত্রণা সইতে কেন আবার বেঁচে উঠলুম—

ললিতা বাধা দিয়ে ধমক দিলে, ঐ সব কথা শোন্‌বার জন্যে তো আমি তোমার পাশে পাশে ঘুর্‌চি না। আমি এক্ষুনি চলে যাবো।

নীতিশের চোখ দু'টি জলে ভরে এলো। ললিতা তার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে আঁচলে চোখের জল মুছে দিলে।

সন্ধ্যার পরে সহদেব এলো। কম্পাউণ্ডে বেড়াতে বেড়াতে ললিতা একসময়ে বল্‌লে, মানুষ নিজেকে না সস্তা করলে কেউ তাকে সস্তা করতে পারে না।

সহদেব জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ললিতার মুখের পানে চাইলে।

ললিতা একখানি উঁচু পাথরের ধারে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, হঠাৎ মাঝে মাঝে এমনভাবে নিজেকে হারিয়ে ফেল কেন বলতো? কী যে ছেলেমানুষী করো!

বল্‌তে বল্‌তে ললিতার গলা ভারী হ'য়ে এলো। অতি কষ্টে কোন রকমে চোখের জল সে সাম্‌লে নিলে।

জ্যোৎস্নায় সমস্ত আকাশটা মুখর হ'য়ে উঠেছিল, ফুলের সুবাসে ও বর্ণ সুষমায় কম্পাউণ্ডটা ভরে গিয়েছিল। ললিতা ঊর্দ্ধমুখে আকাশের পানে চেয়ে বল্‌লে, আমি যে লজ্জায় অপমানে মরে যাই!

—অপমান? আমি তোমাকে অপমান করবার কল্পনাও যে মনে ঠাঁই দিতে পারি না ললিতা!

ললিতা বল্‌লে, কিন্তু ঐ রুগ্ন লোকটি পর্য্যন্ত বুঝেছে যে একটা কিছু হ'য়েচে আমাদের! ওর কাছে এর কৈফিয়ৎ দিতে আমি লজ্জায় মরমে মরে যাই।

সহদেব নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলো।

ললিতা বল্‌লে, এর কী ছাই কৈফিয়ৎই বা দেব, বল্‌বার

কিছু থাক্‌লে তো বল্‌বো। নিজে বুঝলে তবে তো পরকে বোঝাবো।

সহদেব একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে তার কাছ হ'তে সরে যাবার চেষ্টা কর্‌লে। ললিতা তার একখানা হাত চেপে ধরে তাকে বাধা দিয়ে বল্‌লে, যাচ্চো কোথা?

সহদেবের সমস্ত শরীর কেঁপে উঠলো, চোখ দু'টি স্তিমিত হ'য়ে এলো

—বল্‌বে না আমায়, কি করেছি আমি? শাস্তি দেবে, অথচ বুঝতে দেবে না অপরাধটা কি?

ললিতা দাঁতে ঠোঁট্ চেপে মুখখানা শক্ত ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো। চাঁদের আলোয় তার চোখ দু'টো ঝক্ ঝক্ ক'রে জ্ব'লে উঠলো।

সহদেব পাথরখানার একপাসে ব'সে পড়লো। ললিতা তেম্‌নি তার হাতখানা ধ'রে তার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে রইলো।

সহদেব কথা কইতে পারলে না।

ললিতা তেম্‌নি রুঢ়স্বরে বল্‌লে, কতো বড় নিষ্ঠুর তুমি বুঝতে পারচো কি? আঘাত ক'রে যে মানুষ আনন্দ পায়, এই আমি প্রথম দেখলুম।

সহদেবের চোখ দু'টো জলে ভরে এলো, সে মুখখানা নত ক'রে মাটির পানে ঝুঁকে পড়লো।

ললিতা যেন আজ মরিয়া হ'য়ে উঠেচে। সহসা দু'হাতে তার মুখখানি তুলে ধরে বল্‌লে, অমন ক'রে পাশ কাটালে চল্‌বে

না, আজ আমি জান্‌তে চাই আমার অপরাধটা—যার জন্যে তুমি আমায় এমনভাবে শাস্তি দিচ্চ।

সহদেবের গণ্ড বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে প'ড়ে চাঁদের আলোয় চক্‌ চক্‌ ক'রে উঠলো।

ললিতা একটু দমে গেল তার চোখে জল দেখে, কিন্তু সে তখনি নিজেকে সাম্‌লে নিলে। সে একেবারে না-ছোড়-বান্দা। বেশ জোর গলায় বল্‌লে, ও চোখের জলে আমি ভিজ্‌বো! পুরুষ মানুষের কান্নাকে আমি ঘৃণা করি। জোর থাকে, সে জোর গলায় আপত্তি জানাবে, বাধা দেবে, হাল ছেড়ে দিয়ে মেয়ে মানুষের মতো কাঁদ্‌বে না।

সহদেব চোখের জল মুছতে মুছতে মুখ ফিরিয়ে বল্‌লে, কাঁদে, হাতি চোরা বালিতে পা দিয়ে যখন অতলের পানে নাম্‌তে থাকে তখন সেও কাঁদে।

ললিতা নিঃশব্দে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো সহদেবের পানে একদৃষ্টে চেয়ে। তারপর সহদেব যখন তার পানে চাইলে, ললিতা শুধু বল্‌লে, আমি বুঝি চোরা বালি! পরীক্ষা না ক'রে পা দিলে কেন?

সহদেব চেয়ে দেখ্‌লে ললিতার মুখে জ্যোৎস্নাস্নাত আকাশের ছায়া। নির্ম্মল, শান্ত, আলো ঝল্‌মল্‌ করছে। জ্যোৎস্নার পরিপূর্ণতার মতই সে হাসির তরঙ্গ তুলে বল্‌লে, না-জেনে না-চিনে যখন পা দিয়েচো তখন ডুবতেই হবে, উপায় নেই। যে যখন ডোবে তখন অমনি করেই না-চেনার

কাছে বন্দী হওয়ার মাঝে রোমান্স আছে। সে বড় কড়া বাঁধন!

ললিতা হঠাৎ থেমে দু'হাতের বাঁধন দিয়ে সহদেবের কণ্ঠটি বেষ্টন করলে। তার পরে নিজের মুখখানিকে উঁচু ক'রে, আস্তে আস্তে সহদেবের মুখখানিকে নামিয়ে এনে তার সঙ্গে মিলিয়ে দিলে।

ঠিক সেই সময়ে মাথার উপর কোথা থেকে একখানা ছেঁড়া মেঘ ভেসে এসে চাঁদকে আড়াল ক'রে দাঁড়ালো।

পনেরো

একখানা ইজিচেয়ারে শুয়ে নীতিশ একখানা বইয়ের পাতা উল্‌টে যাচ্ছিল। উল্‌টেই যাচ্ছিল পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা, মনের সঙ্গে কিন্তু তার কোন সংযোগ ছিল না। মন দু'হাতে চিন্তার ভিড় ঠেলে ঠেলে দৌড় দিচ্ছিল, কিন্তু পথ এম্‌নি দুর্গম যে মাঝে মাঝে থম্‌কে তাকে দাঁড়াতে হচ্ছিল পিছন পানে চেয়ে। ভয়ে তার বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠ্‌চে, কান্না কণ্ঠের কাছ পর্য্যন্ত স্তব্ধ হ'য়ে যাচ্ছে। জানলার নীচে ঘন হ'য়ে উঠেছে চারা গাছের জঙ্গল, তারি পাশে কাঁকড় বিছানো পথ। সেই পথ সোজা চলে গেছে কতো অসম্ভব দূরে। বইখানা খোলা পড়ে রইলো কোলের ওপর, দৃষ্টি মিশে গেল পথের মাঝে। কতো লোক যাচ্ছে, আস্‌ছে। কিন্তু ফির্‌ছে না শুধু ললিতা! অভিমানে তার বুকখানা ফুলে ফুলে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। নিজের একাকীত্ব স্মরণ করে প্রাণটা তার হাঁপিয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো।

আকাশে মেঘ জমেছে। ঘরের মাঝে তার ছায়া এসে পড়েছে। আলো মেঘের চাপে স্তিমিত হ'য়ে আস্‌ছে। শোঁ

শোঁ শোঁ ক'রে এলোমেলো হাওয়া বইছে, হয়তো রাত্রে বৃষ্টি হ'তে পারে।

উদ্বেগে মন তার অধীর হ'য়ে উঠ্‌লো।

বাইরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। নীতিশ আশ্বস্ত হ'য়ে ঘন ঘন বাইরের পানে চাইতে লাগলো। কিন্তু যার অপেক্ষায় উদ্‌গ্রীব হ'য়ে এতক্ষণ সে পথ চেয়েছিল, সে এল না, তার বদলে ভেজানো দরজা ঠেলে ঘরের মাঝে এসে দাঁড়ালো সহদেব।

নীতিশ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌লে, আসুন। ললিতা কোথায়? সহদেব তার কাছে এসে জিগ্‌গেস করলে, কেমন আছেন? ললিতা এখনো ফেরেনি?

—না।

সহদেব বল্‌লে, তা হ'লে আর কোথাও গেছে। ক'দিন পরে আজ বেরিয়েছে, ফাঁকা পাহাড়ে হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্চে প্রাণভরে। তবে আস্‌বে এখুনি, আপনাকে একটু 'ওভাল্‌টিন' তৈরি ক'রে দিই?

নীতিশ বাধা দিয়ে বল্‌লে, না, না, এখন দরকার নেই।

সহদেব হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে, কিন্তু আমার একটু চায়ের বিশেষ দরকার, কাজেই জল একটু গরম করতেই হবে। একটু বসুন না, এলুম বলে।

সহদেব ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। নীতিশ আড় হ'য়ে ইজি চেয়ারের বুকে গা ঢেলে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে রাশি রাশি

চিন্তা এসে তার মনের মাঝে ভীড় জমালে। সেই সব চমৎকার চিন্তার হাতে আত্মসমর্পণ ক'রে সে শু'য়ে রইলো মৌন যোগীর মতো ধ্যানস্থ হ'য়ে। কিন্তু ধ্যান তার ভেঙ্গে গেল সহদেব ঘরে ঢুক্‌তেই, এবং তাকে সম্বর্দ্ধনা কর্‌তে সে অসংযত হ'য়ে উঠে বস্‌লো।

সহদেব আরাম চৌকির হাতলের উপর কাপ ছু'টো নামিয়ে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বস্‌লো। নীতিশ আলোয়ানখানা পায়ের উপর মেলে দিয়ে সোজা হ'য়ে বস্‌লো।

সহদেব চায়ের পেয়ালাটা তুলে নিয়ে বল্‌লে, নিন্ ওভালটিন্। আমিও চা'টা খেয়ে নিই।

নীতিশ পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে বল্‌লে, এখানে এসে কী কষ্টটাই আপনাদের দিলুম! এখন মনে হয়, না এলেই ছিল ভালো।

সহদেব নির্লিপ্তের মতো বল্‌লে, নিজের কথা আমি বল্‌তে পারি, আমাকে কোনো কষ্টই দেন্‌নি, এবং তার জন্যে কুণ্ঠার কোন কারণই নেই। তবে ললিতার কথা সে নিজে বল্‌বে। কিন্তু আমার মনে হয় আপনাকে সেবা কর্‌বার এম্‌নি একটা সুযোগ পেয়ে সে নিজেকে ধন্য জ্ঞান ক'রেচে। তার সারা জীবনের কামনা কানায় কানায় ভরে উঠেছে।

নীতিশ রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সহদেবের পানে চাইলে, আস্তে আস্তে তার মুখখানা আরক্ত হ'য়ে উঠ্‌লো।

সহদেব একটা সিগার ধরিয়ে হাস্‌লে।

নীতিশ বল্‌লে, কিন্তু আপনার ঋণ আমি শোধ দেব কেমন ক'রে?

—তার উত্তরও পাবেন শ্রীমতী ললিতার কাছে।

নীতিশ মুখ ফিরিয়ে অস্ফুটস্বরে বল্‌লে, আমি যে এর জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিলুম না।

দু'জনে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলো,—খোলা জান্‌লাটা দিয়ে অবারিত আকাশের পানে চেয়ে।

সহদেব এক সময় জিগ্‌গেস কর্‌লে, নীতিশবাবু, কাউকে ভালবেসেছেন কখনো?

নীতিশ চোখদু'টো প্রসারিত ক'রে উত্তর দিল, কেন বলুন তো?

—এম্‌নি জিগ্‌গেস কর্‌চি। চুপ্‌চাপ্ কতোক্ষণ ব'সে থাকা যায়, তার চেয়ে যা-হোক্ একটা আলোচনা করা ভালো, তবু সন্ধ্যেটা কাট্‌বে একরকম।

নীতিশের মুখে ফুটে উঠ্‌লো একটা অস্পষ্ট হাসি। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ক্ষীণ গলায় বল্‌লে, আকাশে মেঘ জমেছে, এক পশলা বৃষ্টি নাম্‌লে মন্দ হয় না, ভালোবাসার কাহিনীটা জমে ভালো।

সহদেব চুরুটের একতাল ধোঁয়া ছেড়ে উচ্চ হাসিতে ঘরখানা কাঁপিয়ে তুল্‌লে।

নীতিশও তার হাসিতে যোগ দিয়ে বল্‌লে, তবে আমাদের শ্রীমতী বাইরে, হঠাৎ বৃষ্টি নাম্‌লে পথের মাঝে তাঁকে বিব্রত হ'য়ে পড়তে হবে।

সহদেবের দৃষ্টিটা সহসা প্রখর হ'য়ে উঠ্‌লো, সে অপলকে নীতিশের মুখের পানে চাইলে।

নীতিশ বোধহয় সহদেবের ভাবান্তর লক্ষ্য ক'রেই বল্‌লে, অনুমতি করেন তো ভালোবাসার কাহিনী আরম্ভ করি। মনটাকে সহজ করবার জন্যে আমারো এম্‌নি একটা আলোচনার দরকার।

সহদেব তাকে বাধা দিয়ে বল্‌লে, মাপ কর্‌বেন, আমি ভালোবাসার থিসিস্‌ শুন্‌তে চাই না, আমি শুন্‌তে চাই আপনি কাউকে কখনো ভালোবেসেছেন কি না ?

নীতিশের মুখখানা লাল হ'য়ে উঠলো। সে একটু ভেবে উত্তর দিলে, ঠিক তা বলা বড় শক্ত। তবে ভাল.বাসার আকাঙ্ক্ষা যে মনে জাগেনি, এ কথা বলতে পারি না। দেহের রক্তে যৌবন জেগে রয়েচে, এবং তার ক্ষুধা আছে। সেই ক্ষুধা মেটাতে হ'লে ভালবাসতে হবে এবং ভালবাসা পেতে হবে। তবে মনে যে আগুন জ্বলে ওঠে, তাকে জীবনের শেষ পর্য্যন্ত জ্বালিয়ে রাখবার জন্যে তেলের প্রয়োজন। তা যদি না থাকে জ্বলে জ্বলে আপনিই তা নিভে যাবে। আমার জীবনেও ভালবাসা তেল হীন প্রদীপের মতো জ্বলে জ্বলে নিভে যেতে বসেছে।

—কেন ?

—আকস্মিক ভাবে ভালবাসার আকাঙ্ক্ষা জাগলো, কিন্তু দৈন্যের ধাক্কায়, অভাবের তাড়নায় সে অঙ্কুরেই শুকিয়ে গেল, প্রসার লাভ করতে পারলে না।

—যাকে ভালবাসলে সে বুঝি ধরা দিলে না ?

নীতিশ হাসলে। বল্‌লে, না, ধরা যে দিল না তা নয়, তার পানে এগোতে পা উঠলো না। নিজের দৈন্য সর্ব্বাঙ্গ অবশ ক'রে দিল। মুখ ফুটে বল্‌তেও পারলুম না, সাহসও হলো না। দারিদ্র্য মানুষের মনকে পিষে মেরে ফেলে। বিধাতাই যাকে ভালবাসলেন না, অনাদরে সংসারে পাঠালেন, তাকে ভালবাসবে কে ?

নীতিশের গলা ভারী হ'য়ে এলো।

সহদেব জিগ্‌গেস করলে, আপনি যাকে ভালবেসেছিলেন সে কি ধনীর মেয়ে ?—

—তা ঠিক নয়, কিন্তু সে তো সজীব মানুষ, তাকে বাঁধবো কি দিয়ে আমি ? সে সঙ্গতি, সে সামর্থ্য আমার কোথায় ?

সহদেব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিঃশব্দে তার মুখের পানে চাইলে। অতীতের রুদ্ধ দ্বার ভেঙ্গে মনের মাঝে জেগে উঠ্‌লো পঁচিশ বছর পূর্ব্বের কথা! মনের আকাশে ভেসে উঠ্‌লো মলিনা। নীতিশও আনত মুখে স্তব্ধ হ'য়ে রইল।

বাইরে বৃষ্টি নেমেছে। গাছের পাতায় বৃষ্টির শব্দ সুরের ইন্দ্রজাল রচনা ক'রচে। আর্দ্র বায়ু হু-হুচ্ছাসে খোলা জানালা দিয়ে ঘরের মাঝে ছড়িয়ে পড়লো। সহদেবের চেতনাকে তা স্পর্শ করতে পারলে না।

নীতিশ বাইরের পানে চেয়ে বল্‌লে, ললিতা তো এখনো ফিরলো না।

সহদেব চমকে ব'লে উঠলো, কী, ললিতাকে আপনি ভালবাসেন ?

—না তা বলিনি, সে এখনো ফিরলো না কেন তাই বলচি।

নীতিশের বুকের মাঝে অস্থির অপেক্ষা। সে উদগ্রীব হয়ে ঘন ঘন বাইরের পানে চাইতে লাগলো।

সহদেব নীতিশের কথায় লজ্জিত একটু হ'য়েছিল, কিন্তু তার চেয়ে বেশী হলো আশ্বস্ত। ভাগ্যি নীতিশ বলেনি যে ললিতাকে সে ভালবাসে, তা'হলে সহদেব কী বল্‌তো, কী করতো সে !

সহদেবের মনে অনেক কথা জমা হ'য়েছিল, নীতিশকে একা পেয়ে অনেক কথাই সে বল্‌তে চেয়েছিল, এবং আরম্ভও করেছিল, কিন্তু মাঝ পথে এসে সব তালগোল পাকিয়ে গেল। যা জান্‌তে চেয়েছিল, সবই গুলিয়ে গেল। সে সজোরে ঘন ঘন সিগারে টান দিতে লাগলো।

নীতিশ তার ভাবান্তর লক্ষ্য করলে কিনা কে জানে, কিন্তু তাকে ভারী অন্যমনস্ক মনে হলো।

দু'জনে চুপচাপ ব'সে থাকা ভারী বিশ্রী। একজন চেয়ে আছে বাইরের বৃষ্টিধারার পানে, একজন দেখছে অবারিত আকাশবুকে মেঘের চপললীলা !

প্রায়ান্ধকার ঘরের মাঝে এমনি নিঃশব্দে ব'সে ব'সে একসময় হাঁপিয়ে উঠে সহদেব জিগ্‌গেস করলে, নীতিশবাবু, আপনি কিসে এম, এ, ?

—ইংরেজী সাহিত্যে।

—ফার্ষ্ট ক্লাস পেয়েছিলেন ?

—আজ্ঞে না, সে সৌভাগ্য হয় নি। তা'হলে আর স্কুলে মাষ্টারি করতে হতো না, একটা প্রোফেসারি পাবার আশা থাকতো। সেকেণ্ড ক্লাস ফার্ষ্ট হ'য়েছিলুম।

"হুঁ" ব'লে সহদেব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌লে। সহসা উঠে ঘরের মেঝেয় পায়চারী করতে করতে সে জিগগেস করলে, আপনার আর কে আছে, নীতিশ বাবু ?

—আজ্ঞে, কেউ না। আমি আমার পিতামাতার একমাত্র সন্তান। যখন আমার বয়স আট বছর সেই সময় একদিনে আমার বাপ মা দু'জনেই স্বর্গারোহণ করেন।

—একদিনে ? কী রকম !

—আজ্ঞে হাঁ, আমার পিতার মৃত্যুর মিনিট কয়েক পূর্ব্বে তিনি আত্মহত্যা করেন। এবং এক চিতায় দু'জনকে দাহ করা হয়। সেকালে যেমন সতীদাহ হতো। সংসারে আর এমন কেউ ছিল না যে আমার ভার নিয়ে আমায় প্রতিপালন করে। আশ্রয় বল্‌তে, আত্মীয় বল্‌তে, সমাজ বল্‌তে আমার কিছুই ছিল না।

সহদেব জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দিয়ে নীতিশের মুখের পানে চাইলে।

নীতিশ উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছিল। সে বল্‌লে, ছিল না যে কেউ তা নয়, ছিল সবাই; কিন্তু কেউই তাদের আশ্রয় দেয় নি, কেন জানেন ? তাদের বিয়ে হয়নি, লোকাচার তাঁরা মানেন

নি। ধর্ম্ম মতে তাঁরা ছিলেন স্বামী-স্ত্রী, কিন্তু সমাজ সে বিবাহ অনুমোদন করে নি। অসবর্ণ বিয়ে সমাজ অগ্রাহ্য করলে কারণ সে বিয়ের ভিত্তি ছিল প্রেম, মন্ত্র নয়।

—তাই নাকি?

সহদেব বিস্ফারিত দৃষ্টি দিয়ে নীতিশের মুখের পানে চাইলে।

নীতিশ বল্‌লে, আজ্ঞে হ্যাঁ। জানিনা আমার সম্বন্ধে আপনি কি ভাবচেন, সংসারে বিধাতা পাঠালেন অনাদরে, সমাজ দেখলে ঘৃণার চোখে, কিন্তু তবুও আমার পিতামাতার কথা মনে হ'লে গৌরবে ও গর্ব্বে আমার বুকখানা ফুলে ওঠে। মা ছিলেন আমার সতী।

নীতিশ সহসা থাম্‌লো। সহদেব নিঃশব্দে অপলকদৃষ্টি দিয়ে তার পানে চেয়ে রইলো।

নীতিশ বল্‌লে, তারপর এই দীর্ঘ পনেরোটি বচ্ছর নিজের ওপর নির্ভর করে কী ভাবে যে দেহ ও মনকে একত্র রেখেচি, সে একটা ইতিহাস!

—ইতিহাস বলবেন পরে এখন ওষুধ খাবার সময় হ'য়েচে, দয়া ক'রে ওষুধটা খেয়ে ফেলুন দিকি—

পাশের ঘরে ললিতার কণ্ঠস্বর শোনা গেল। দু'জনে চেয়ে দেখলে ললিতা পাশের ঘরে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে চুলগুলো পিঠের ওপর এলিয়ে দিয়ে শুকনো তোয়ালে দিয়ে মুছচে।

সহদেব জিগগেস করলে, খুব ভিজেচো?

—তা একটু ভিজেছি বৈকি। শীতের দিনের বৃষ্টি ব'লেই যা, নইলে বৃষ্টির মুখে ভেজার আনন্দ আছে।

নীতিশ বল্‌লে, অসুখ হবারও 'চান্স' যথেষ্ট আছে। কখন এলে তুমি ?

ললিতা উত্তর দিল, অনেকক্ষণ এসেছি, দরজার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমার ইতিহাস শুনছিলুম।

নীতিশ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌লে।

ললিতা বল্‌লে, ওষুধটা খেয়ে নাও। আমি আলো জ্বেলে আনি আর একটু চা তৈরী করি।

ললিতা গুন্ গুন্ করে কি একটা গান গাইতে গাইতে ঘর হতে চলে গেল।

সহদেব উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের মেঝেয় পায়চারী করতে লাগলো।

পাশের বারন্দা হ'তে অস্পষ্ট গানের সুর ভেসে এলো ঃ ললিতা গাইছে ঃ

মেঘের পরে মেঘ জমেছে, আঁধার ক'রে আসে,
আমায় কেন বসিয়ে রাখো একা ঘরের পাশে ॥

নীতিশ একটু হেসে বল্‌লে, ইস্, শ্রীমতীকে আজ হঠাৎ গানে পেয়ে বসলো যে! ব্যাপার কি বলুন তো, মিঃ সরকার ?

সহদেব থম্‌কে দাঁড়ালো। মনের উদ্বেগ চাপা দেবার জন্যে সে কথা বল্‌তে চাইলে, কিন্তু কথা জোগাল না।

নীতিশ বল্‌লে, মনে বাদল হাওয়ার ছোঁয়াচ লাগলো নাকি ?

সহদেব প্রবল বেগে মাথা নেড়ে শুধু হাসলে।

নীতিশ বাইরের পানে তাকালে। বৃষ্টি থেমে গেছে। ভিজে ভারী মেঘে আকাশটা থমথম্ করচে। ভিজে গাছের পাতা হতে ফোঁটায় ফোঁটায় জল ঝ'রে পড়চে। পাথরের বুক বেয়ে চড়াই হ'তে জল নামচে কল্ কল্ শব্দ ক'রে। স্তব্ধ অন্ধকারের বুকে সেই শব্দ ধারালো হ'য়ে উঠ্‌চে সমুদ্র কল্লোলের মতো।

নীতিশ একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছিল, সহসা সহদেব এসে তার কাঁধের ওপর একখানা হাত রেখে উত্তেজনার কণ্ঠে বল্‌লে, নীতিশ বাবু, আপনি এক কাজ করুন না।

নীতিশ তার কণ্ঠস্বরে চম্‌কে উঠে বল্‌লে, বলুন।

—আপনি বিলেত যান না। সেখানকার একটা ডিগ্রী নিয়ে ফিরতে পারলে অনেকখানি সুবিধে হ'তে পারে।

নীতিশ বিহ্বল বিস্ময়ে তাঁর মুখের পানে চেয়ে বল্‌লে, আপনি কি আমাকে উপহাস করচেন মিঃ সরকার? সামান্য একটা স্কুল মাষ্টার আমি! আশী টাকা সই ক'রে ষাট্ টাকা মাইনে আমার বরাদ্দ, আমার বিলেত যাওযার স্বপ্ন দেখা দুরাশা নয় কি?

বলতে বলতে চোখ দু'টী তার ছল ছলিয়ে এলো। ব্যাপারটা যে এম্‌নি বিশ্রী ও অসম্মানজনক হ'য়ে দাঁড়াবে সহদেব ভাবতেও পারেনি।

ব্যাপারটাকে সহজ ক'রে নেবার জন্যেই সহদেব সহসা নীতিশের পিঠ চাপড়ে বল্‌লে, তা কথাটা মিছে নয়, বিলেত

যাবার কথা উঠলেই, প্রথমে মনে জাগে ঐ খরচের ভাবনাটা।

নীতিশ গম্ভীর হ'য়ে বল্‌লে, নিশ্চয়ই!

সহদেব হো হো করে হেসে ঘরখানাকে কাঁপিয়ে তুল্‌লে।

একটা ট্রেতে চা আর বিস্কুট নিয়ে ললিতা ঘরের মাঝে এসে থম্‌কে দাঁড়ালো: সহদেবের হাসির কারণটা নির্ণয় করতে তাকে বেশ একটু বেগ পেতে হলো।

ললিতা ট্রেখানা নামিয়ে জিগগেস করলে, ব্যাপারটা কী?

নীতিশ বল্‌লে, ব্যাপারটা এমন কিছু শক্ত নয়, কুঁজোর চিৎ হয়ে শোওয়ার ব্যাপার। রাণাঘাট হাই স্কুলের মাষ্টার 'হায়ার ষ্টাডির' জন্যে য়ুরোপ যাচ্চে।

সহদেব গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলে, আর তার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করচে সহদেব সরকার।

ললিতা একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো এবং একখানা বিস্কুটে কামড় দিয়ে বল্‌লে, ক্ষিদেয় আমার পেট জ্বলে যাচ্চে, মাপ চাইচি, আমি অপেক্ষা করতে পারলুম না। মশায়রা যতক্ষণ স্বপ্ন দেখবেন, আমি ততক্ষণে দু' পেয়ালা চা নিঃশেষ ক'রে ফেলবো।

সহদেব বল্‌লে, আমাদের তাতে কোন আপত্তি নেই। তবে এ কথা সত্যি, নীতিশ বাবু বিলেত চল্লেন, একটু শরীরটা সারলেই।

চায়ের একটা পেয়ালা তুলে নিয়ে সহদেব বল্‌লে, আপনি মন ঠিক ক'রে ফেলুন নীতিশ বাবু। অন্য কোন চিন্তা আপনাকে করতে হবে না—সেখানে গিয়ে কি পড়বেন ঠিক করুন।

ললিতা চায়ের বাটীতে চুমুক দিতে দিতে চোরা চাউনীতে সহদেবকে ভ্রূকুটি করলে।

সহদেব বল্‌লে, হাঁ, একটা কথা বলা ভালো নীতিশবাবু, আপনার যদি মনে কোন রকম সঙ্কোচ জাগে যে আপনি আমার টাকা নেবেন কেন, তাহলে তার উত্তরে আমি বলবো, এ টাকা আমি আপনাকে দেব বৃত্তি হিসেবে।

নীতিশ ও ললিতা মুখ চাওয়া চাওয়ি করলে।

সহদেব সহসা ললিতার একখানা হাত ধরে বল্‌লে, কী বলো তুমি ললিতা, তোমার কি মত? অমন একটা জীবন কেন অনর্থক নষ্ট করবেন?

ললিতা সহসা সহদেবের মুখের পানে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বল্‌লে, আচ্ছা সরকার মশায়, কতো টাকা আপনার আছে যে আপনি নীতিশ বাবুকে বিলেত পাঠাবেন, আবার আমাকে সেক্রেটারী রাখবেন আড়াইশো টাকা মাইনে দিয়ে?

সহদেবের মুখখানা সহসা আরক্ত হ'য়ে উঠলো, সে কম্পিত ঝাঁঝালো গলায় উত্তর দিলে, যদি জানাবার দিন আসে তোমায় জানাবো একদিন, সে কথা জানবার জন্যে এত ব্যস্ত কেন?

সহদেব উঠে দাঁড়ালো এবং ধীরে ধীরে কোন কিছু না ব'লে ঘর হ'তে বেরিয়ে গেল।

নীতিশের কাছে সরে গিয়ে ললিতা বল্‌লে, কী ভাবচো? ও সব কথা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না, ও যেমন পাগল!

—পাগল ব'লে কিন্তু আমার মনে হয় না, তাই আমি

ভাবছি, আশ্চর্য্য! মানুষের দারিদ্র্য অনুমান করা যত সহজ, আসল মূল্য অনুমান করা তত সহজ নয়!

ললিতা বল্‌লে, যত বেশী সূক্ষ্ম ক'রে কথাটাকে ভাবচো আসলে ওটা তত সূক্ষ্ম নয়। সামান্য একটা ছোট্ট ব্যাপার থেকেই এর মীমাংসা করা যায়। যেমন, অসাধারণ যদি কিছু হ'তো তাহলে এখানে মনোহারী দোকান করতো না।

নীতিশ বল্‌লে, ও যুক্তির কোন অর্থ হয় না। টাকা আছে ব'লে টাকা রোজগার করবো না, এটা হচ্চে আমাদের মতো যারা, তাদের যুক্তি,—অপরের নয়। আমার এক বন্ধু বলেছিল, এখনো একটা রিষ্ট ওয়াচ রয়েচে, এবং একটা পারকারের কলম রয়েচে, অতএব দু'চার দিন ভাববার কোন দরকারই নেই।

ললিতা বাধা দিয়ে বললে, ভারী নতুন কথা বল্‌লে, আমার এক বন্ধু আংটি বিক্রী ক'রে কাটলেট আর বিয়ার খেয়েছিল।

ষোল

সেই দিন রাত্রে।

নীতিশ অকাতরে ঘুমুচ্চে। পাশের ঘরে ললিতা পড়বার চেষ্টা করছিল, কিন্তু মন বসছিল না। সহদেব ঘুমিয়েছে কিনা দেখবার জন্যে হঠাৎ ললিতা সহদেবের ঘরের দোরে ধাক্কা দিলে। দরজা ভেতর হতে বন্ধ ছিল না, ধাক্কা দিতেই খুলে গেল। দেখলে, ঘরে আলো জ্বলছে, বিছানার ওপর সহদেব পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। দরজা খোলার শব্দে সহদেব ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়ালো, এবং ললিতার কাছে ধরা পড়বার ভয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলে। কিন্তু ললিতার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সে এড়াতে পারলে না, ললিতা দেখলে সহদেবের চোখে জল। ললিতা মুহূর্ত্ত থমকে দাঁড়ালো, সহদেব চকিতে কোঁচার খুঁটে চোখের জল মুছে নিলে।

ললিতা কোন কিছু না ব'লে ধপ ক'রে সহদেবের বিছানার প্রান্তে ব'সে পড়লো।

সহদেব ভাঙ্গা গলায় জিগ্‌গেস করলে, এত রাত্রে উঠে এলে যে?

ললিতা গম্ভীর গলায় উত্তর দিলে, তুমি ডাকছিলে যে!

—কই না!

আবার মিছে কথা? ললিতা ধমক দিলে।

সহদেব থতিয়ে গেল, উত্তর দিতে পারলে না।

ললিতা তার একখানা হাত ধ'রে বললে, বসো।

সহদেব অভিভূতের মত ললিতার পাশে বসলো। ললিতার হাতের মাঝে সহদেবের হাতখানা ঠক্ ঠক্ করে কেঁপে উঠলো।

ললিতা নীচু গলায় জিগ্গেস করলে, বলো ডাকনি! তবে কি না ডাকতেই আমি এসেছি?

সহদেব শুধু বিহ্বলের মত তার মুখের পানে চাইলে।

ললিতা বল্লে, বলো না ডাকছিলে কিনা? ডাক্ছিলে না?

সহদেব মন্ত্রাভিভূতের মত ঘাড় নাড়লে, হ্যাঁ।

ললিতা সকরুণ সুরে বল্লে, তা আমি জানি, তাই আমার পড়ায় মন বস্লো না, উঠে এলুম।

সহদেব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেল্লে। তার বুকের মাঝে আনন্দ নিবিড় হয়ে এল, কান্না স্তব্ধ হয়ে গেল।

ললিতা আবার বললে, আরো গোটা কয়েক তোমার মনের কথা আমি জান্তে চাই, বলবে কি?

—বলবো। আজ তোমাকে কোন কথা লুকবো না।

—নীতিশকে তুমি অমন করে নাচাচ্চ কেন?

—আমি? নীতিশকে নাচাচ্চি!

—তবে না তো কি আমি! তুমি তাকে য়ুরোপ পাঠাচ্চো।

—তুমি অন্য রকম ভাবতে পার, আমি কিন্তু মোটেই অন্য রকম ভাবি নি।

—তার মানে? আমায় বিশ্বাস করতে বলো যে তুমি টাকা খরচ ক'রে ওকে বিলেত পাঠাবে?

—অবিশ্বাস করবার এর মাঝে কিছু আছে কি?

—ধরলুম নেই, এবং তোমার যথেষ্ট টাকা আছে, কিন্তু ওর জন্যে খরচ করবে কেন?

সহদেব প্রথমটা কি উত্তর দেবে ভেবে পেলে না, একটু ভেবে বললে, তার মাঝে আমার স্বার্থ আছে, গভীর স্বার্থ আছে।

—কি রকম?

.—তোমাকে পাবার পথটা সহজ করে আনা। তোমার কাছ থেকে তাকে দূরে পাঠানো।

ললিতা স্তব্ধ একাগ্র দৃষ্টি দিয়ে সহদেবের পানে চেয়ে রইল।

সহদেব হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে, অবাক হয়ে ভাবচো কতো হীন আমি, কিন্তু উপায় নেই। অনিশ্চিতের মধ্যে ধাঁধাঁয় পড়ে দিন কাটানো যায় না। লোভ বেশী তোমার ওপর, টাকার মায়া করলে চলবে না।

—অর্থাৎ ঘুষ দিয়ে ওর কাছ থেকে আমায় আদায় করতে চাও?

া, ঠিক তা নয়। ওর কাছ থেকে তোমাকে ভিক্ষাও

চাইবো না, জোর করে ছিনিয়েও নেব না। তোমার সত্তা যদি স্বাধীন না হয়, তাহলে আমি তোমায় চাইবো না।

—আমি তো তা বলিনি।

ললিতা লজ্জিত হয়ে পড়লো।

সহদেব বল্‌লে, তবে তুমি কেন বল্‌চো ওর কাছ থেকে তোমায় আদায় করতে হবে।

—তবে তুমিই বা ওকে দাম দেবে কেন?

—আমি দাম দিচ্ছি না। আমাদের মাঝে ওকে আমি সইতে পারচি না, তাই ওকে দূরে সরাতে চাইচি।

ললিতা হাসলে। বললে, কিন্তু ও তো আমাদের কোন ক্ষতি করেনি।

—ও তোমায় চায় বা তোমার আশা রাখে।

—আর আমি?

—তোমার কথাও তো আমি জানতে চাই; আমার জানা দরকার।

—অবিশ্যি। যদি বলি আমি সারা জীবন তোমায় সুখী করবার চেষ্টায় প্রাণপাত করবো, তোমায় জীবনে কখনো ফাঁকি দেব না, তবুও কি তুমি ওর ভয় করবে?

—কিন্তু ওকে দূরে পাঠাতে তোমার আপত্তি আছে? ওকে যদি তুমি না ভালবাসো, না চাও তবে তুমিই বা ওকে নিয়ে এই নিষ্ঠুর খেলা খেলচো কেন? ওকে ধরে রাখচো কেন?

—ও তো আমায় তেমন ভাবে চায় না, ওর সঙ্গে আমার

পাঁচ বছরের আলাপ, কিন্তু কোন দিন তো আমাকে সে আভাস দেয় নি। ও মাটির মানুষ, ওর ওপর কোন রকম অত্যাচার করতে আমার মন ওঠে না। তবে ওকে মেনে নিতে হয়,—ওকে কাছে না পেলে আমার চলবে না, ওর মনের সঙ্গে মিশে স্বপ্ন হয়েই থাকবো। আসল মানুষটাকে চাইবো না।

—চাইতে গেলে ললিতা সবটাই চাইতে হয়, খানিকটা বাদ দিয়ে চাওয়া চলে না।

ললিতা কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললে, আচ্ছা দু'জনকে ভালবাসা চলে না?

সহদেব নিঃশব্দে ঘাড় নাড়লে।

ললিতা অশান্ত হ'য়ে বললে, কেন চলে না? দুজনকে নিয়ে সংসার পাতা চলে না হয়তো, কিন্তু তাই ব'লে দুজনকে ভালবাসা চলে না কেন?

—কিন্তু দুজনের মধ্যে একজনকে বেছে নিতে হয়।

—তা যেন হয় একটা বাসা বাঁধবার জন্যে, কিন্তু দুজনকে মন দিয়ে ভালবাসা চলবে না কেন?

সহদেব অসহিষ্ণু কণ্ঠে উত্তর দিল, তা না হয় চলতে পারে, কিন্তু তুমি কি বলতে চাও, বলোনা—

—তুমি ভয় করোনা। তোমায় আমি কোনদিন দুঃখ দিতে পারবো না। ওর সঙ্গে আমার নেওয়া-দেওয়ার কোনো সম্বন্ধ নেই, ওকে একেবারে আমার কাছ ছাড়া করতে চেওনা, ও বড় নিঃসহায়।

ললিতা সহসা সহদেবের কোলের ওপর মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বালিকার মতো কাঁদলে।

সহদেব তার বিস্রস্ত চুলের মাঝে হাত ডুবিয়ে অবাক হয়ে ব'সে রইল।

পরদিন।

ললিতার উঠতে অনেকখানি বেলা হ'য়ে গেল। বাইরে এসে দেখলে বারাণ্ডায় নীতিশ পায়চারি করচে। সহদেবের ঘরের মাঝে এসে সহদেবকে খুঁজে পেলে না। নীতিশও কোন সন্ধান দিতে পারলে না।

শূন্য ঘরখানার মাঝে ঢুকে ললিতা থমকে দাঁড়ালো। আতঙ্কে তার বুকখানা কেঁপে উঠলো। টেবিলের উপর পড়ে রয়েছে একখানা খোলা চিঠি। কম্পিত হাতে চিঠিটা তুলে নিয়ে ললিতা লোহার খাটখানার উপর বসে পড়লো। খাটখানা সশব্দে আর্ত্তনাদ ক'রে উঠলো।

চিঠিখানা এই :—

ভয় ক'রোনা, কোন প্রার্থনা নেই, কোন নালিশ নেই ললিতা! তোমায় মুক্তি দিয়ে এখান হতে পালিয়ে চললুম। তুমি আমায় হাত ধ'রে পথের মাঝে টেনে এনে যাত্রা সুরু করিয়েছিলে, তোমার সঙ্গে পথ চ'লে জীবনে যে-আনন্দের স্বাদ অপরিচিত ছিল তার আস্বাদ পেয়েচি। তবে যেখানে

পৌঁছবো ব'লে যাত্রা সুরু করেছিলুম, সেখান পর্য্যন্ত যেতে তোমার পা উঠলো না। মাঝ পথে থম্‌কে দাঁড়ালে, পিছন ফিরে।

তোমার মাঝে যে রত্ন আবিষ্কার করেছিলুম, তা চাইনি ব'লে চলে যেতে পারি, এমন শক্তি বা অহঙ্কার নেই। তুমি আমার জীবনের পরম বন্ধু, পরমাত্মীয়। এ বন্ধুত্বের দাম দিতে পারি এমন সঙ্গতি আমার নেই। নীতিশকে সুখী ক'রো, জীবনের সমস্ত সম্পদ দিয়ে তাকে মেনে নিয়ো।

জীবনের শেষ দিনটি পর্য্যন্ত তোমার স্মৃতিটুকু বীজমন্ত্রের মতো জপ করবো। তোমার প্রতিবিম্ব যা আমার মনের আয়নায় জ্বল্ জ্বল্ করচে তার পানে চেয়েই আমার বাকি জীবন কাটবে।

সহসা আমায় পথ বদ্‌লাতে হলো, তার জন্যে ধাক্কা খেতে হবে নিশ্চয়ই, কিন্তু এখানকার এই ক'টি দিনের আনন্দ যা তুমি পরিবেশন করেছিলে তার চেতনাই আমার সকল ব্যথাকে রঙীন করে রাখবে।

আমি নীতিশকে বিলেত পাঠাতে চেয়েছিলুম, তোমার কাছ হ'তে দূরে সরিয়ে দিয়ে তোমাকে পাবার পথটা সহজ ক'রে নেবার জন্যে, কিন্তু তার প্রয়োজন নেই। তোমাকে তারই হাতে দিয়ে যাচ্চি, তার যতটুকু পরিচয় এ কদিনে পেয়েচি, তাতে আমার মনে হয় তোমাকে তার চেয়ে বেশী যত্ন করতে কেউ পারবে না। তাকে য়ুরোপ যাত্রার ব্যবস্থা করতে

ব'লো, এ আমার অনুরোধ, এবং সঙ্গে যেও তুমি। যাবার আগেই বিয়ের ব্যাপারটা এইখানে সেরে যেও। আমার তরফ হ'তে যা প্রতিজ্ঞা ক'রেচি তা সেখানে গিয়েই আমি ব্যবস্থা করবো।

আমার খোঁজ ক'রো না। তোমরা এখান হতে চলে গেলে আবার আমি এখানে ফিরে আসবো, এবং বাকী দিনগুলো এখানেই কাটাবো। এখানকার দোকান—যেখানে হাতড়ে হাতড়ে তোমায় আবিষ্কার করেছি, সেটী আমার কাছে মন্দিরের মতো পবিত্র, তাই সে বাড়ীটি আমি কিনে নিয়েচি, অবশ্য খুব চড়া দামে।

আমার কথা ভেবে যেন তোমাদের প্রেম বিস্বাদ হ'য়ে না ওঠে, ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা। তুমি সুখী হও, ললিতা বন্ধু আমার! বিদায়!

সহদেব সরকার

চোখের জলে ললিতার সামনের সবই অন্ধকার হ'য়ে এল। মুখের সমস্ত রক্ত গেল উবে, পাথরের মুর্ত্তির মত সাদা গাল বেয়ে দরদর ধারে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। মনের মাঝে ভেসে উঠলো সহদেবের ব্যথিত কুণ্ঠিত মূর্ত্তি!

নীতিশ কখন এসে ঘরের মাঝে দাঁড়িয়েছে ললিতা তা জানতে পারে নি, জানতে পারলে, যখন সে তার কোলের উপর হতে চিঠিখানা তুলে নিলে।

ললিতা নীতিশের মুখের পানে চেয়ে ভেঙ্গে পড়লো। দুহাতে মুখ ঢেকে সে অঝোরে কাঁদলে।

নীতিশের মুখে কথা জোগালো না, সে স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

সপ্তাহ পরে রেজেষ্টারী ডাকে একখানা চিঠির সঙ্গে খুব বড় একখানা খাম এলো। ললিতা নীতিশের মুখের পানে তাকিয়ে সই করে নিলে।

চিঠি খুলে দেখলে, কলিকাতার এক এটর্ণি বাড়ী হতে চিঠি এসেচে। সহদেব সরকারের এটর্ণি তাদের অফিসে দেখা করবার জন্যে এদের অনুরোধ করেচে। মিঃ সরকার তাদের বিলাত যাত্রার ব্যবস্থা করবার জন্যে তাঁর এটর্ণিকে সমস্ত উপদেশ দিয়ে গেছেন এবং টমাস কূকের ব্যাঙ্কে টাকা গচ্ছিত রেখে গেছেন। তাঁদের উপদেশ পেলেই এটর্ণি তাদের যাত্রার ব্যবস্থা করবেন।

দ্বিতীয় বড় খামখানি খুলে দেখা গেল, একখানি দান পত্র। তাদের বিবাহের যৌতুক স্বরূপ তিনি ভবানীপুর বেলতলা রোডের একখানি সুবৃহৎ বাড়ী তাদের দান করেছেন। তার দাম হবে আন্দাজ পঞ্চাশ হাজার টাকা! এটর্ণি লিখেচে, তারা ফিরলেই তিনি তাদের বাড়ীর দখল দেবেন।

ললিতা নীতিশের মুখের পানে চাইলে, বিস্ময়ের আতিশয্যে! নীতিশের অশ্রুভরা চোখে তার চেয়েও প্রচণ্ড বিস্ময়!

ললিতা সইতে পারলে না, সে নীতিশের কোলের উপর মূর্চ্ছিতা হ'য়ে পড়লো।

শেষ